Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মর্জিনা আক্তার স্বপ্না

রোলঃ 23090120152



২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মর্জিনা আক্তার স্বপ্না

রোলঃ 23090120152

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মর্জিনা আক্তার স্বপ্না, আইডিঃ 23090120152 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Shopna

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

**মর্জিনা আক্তার স্বপ্না**

আইডিঃ 23090120152

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

## সূচিপত্র

■ অধ্যায়-০১) ভূমিকাঃ ..... 5

■ অধ্যায়-০২) সাহাবাদের সংজ্ঞা ও পরিচয়ঃ ..... 6

■ অধ্যায়-০৩) সাহাবীদের সংখ্যা ও চেনার উপায়ঃ ..... 9

■ অধ্যায়-০৪) কুরআনের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাঃ ..... 10

■ পরিচ্ছদ-০১ঃ সাহাবীদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মর্যাদাঃ ..... 11

পরিচ্ছদ-০২ঃ সাহাবীদের ঈমান ও ত্যাগের প্রশংসাঃ ..... 12

পরিচ্ছদ-০৩ঃ সাহাবীদের ঈমানের দৃঢ়তা ও ত্যাগ: ..... 14

পরিচ্ছদ-০৪ঃ সাহাবিদের অনুসরণে হিদায়াত ও সফলতা: ..... 18

■ অধ্যায়-০৬ঃ হাদিসের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা: ..... 27

■ প্রচ্ছদ-০১ঃ সাহাবীরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আদর্শ: ..... 27

■ প্রচ্ছদ-০২ঃ সাহাবীরা উম্মতের জন্য নিরাপত্তা: ..... 28

■ প্রচ্ছদ-০৩ঃ সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অংশ ও নিদর্শন: ..... 29

■ প্রচ্ছদ-০৪ঃ সাহাবীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের পরিণতি: ..... 32

■ প্রচ্ছদ-০৬ঃ সাহাবীদের অবস্থান অন্য সবার উর্ধ্বে: ..... 34

■ প্রচ্ছদ-০৭ঃ উলামাদের দৃষ্টিতে সাহাবীদের মর্যাদাঃ ..... 35

■ অধ্যায়-০৬ঃ বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবীদের নামঃ ..... 36

■ ০১) আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ..... 36

■ ০২) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.): ..... 49

■ ০৩) উসমান ইবনে আফফান (রা.): ..... 53

■ ০৪) আলী ইবনে আবু তালিব (রা.): ..... 57

■ ০৫) তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.): ..... 60

■ ০৬) যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.): ..... 61

■ ০৭) আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.): ..... 64

■ ০৮) সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.): ............................................................ 65

■ ০৯) সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.):........................................................................ 69

■ ১০) আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ্ (রা.):........................................................... 72

■ ১১) বিলাল ইবনে রাবাহ (রা.): ..................................................................... 75

■ ১২) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রা.):.................................................. 76

■ ১৩) ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (রা.):....................................... 77

■ ১৪) হামযাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.):......................................................... 79

■ অধ্যায়-০৭ঃ সাহাবীদের অবদান( ইসলাম প্রচার, যুদ্ধ, শিক্ষা ও কুরআন সংরক্ষণ): 81

■ অধ্যায়-০৮ঃ সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা ও অনুসরণের নির্দেশঃ.......................... 84

■ অধ্যায়-০৯ঃ সাহাবীদের সম্পর্কে বিভ্রান্ত মতবাদ ও  তার জবাবঃ......................... 86

■ অধ্যায়-১০ঃ সাহাবীদের জীবনি থেকে শিক্ষাঃ ...................................................... 90

■ অধ্যায়-১১ঃ উপসংহার ........................................................................................ 93

## ■ অধ্যায়-০১) ভূমিকাঃ

- ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা মানবজীবনের প্রতিটি দিকের সঠিক দিশা দেয়।

এই মহান ধর্ম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছে। নবী কারিম (স.) এর জীবনে ইসলামের বাস্তব রূপ সবচেয়ে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিলো। কিন্তু নবীজির মৃত্যুর পর তাঁর জীবন,আদর্শ ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব যে মহামানবেরা পালন করেছেন তারাই হচ্ছেন সাহাবী বা নবীজির সাহাবাগণ (رضي الله عنهم)

- সাহাবীরা হলেন সেই সৌভাগ্যবান মানুষ যারা নবীজির সাক্ষাৎ লাভ করেছেন,তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং ঈমানরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁদের দ্বারাই ইসলাম পৃথিবীর কোণে কোণে ছড়িয়ে পরেছে। তাই সাহাবাদের মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝতে পারার মানেই হচ্ছে ইসলামের মূল কাঠামো বোঝা।
-

## ■ অধ্যায়-০২) সাহাবাদের সংজ্ঞা ও পরিচয়ঃ

*সংজ্ঞাঃ*

■ **"সাহাবি" আরবিতে (الصحابِي) শব্দটি এসেছে "সুহবা" (صُحْبَةٌ)**, *থেকে, যার অর্থ "সঙ্গ দেওয়া" বা "সহচর হওয়া"।*

■ *ইসলামি পরিভাষায় সাহাবী বলতে তাকে বুঝায় যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাক্ষাৎ করেছেন,তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং ঈমানরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন।*

*পরিচয়ঃ*

■ ***সাহাবায়ে কেরামের পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম কুরতবী (রহ.) বলেন,***

***إِنَّ كُلِّ مُسلِمٍ رَأَى رسوْلَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وَ سلَّمَ فَهُوَ مِنْ أَصحابِهِ***

***"প্রত্যেক ঐ মুসলমান, যিনি রাসূল (সা.) দেখেছেন, তিনিই সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত।"*** *(তাফসীরে কুরতুবী,পৃষ্ঠা ২৩৭)*

■ ***ইমাম বুখারী (রহ.)*** তার হাদীস গ্রন্থে বলেন,

***مَنْ صَحِبَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَوْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ مِنْ أَصْحابِهِ***

***"মুসলমানদের মধ্যে যিনি রাসূল (সা.) কে দেখেছেন, তাঁর সংশ্রবে এসেছেন তিনি সাহাবী।"***

■ ***আল্লামা ইবনে হাজার*** *তার **"الا صابة فِى تَمْيِيْزِ"** গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,*

***إِنَّ الصَّحابِيَّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سلَّمَ مُومِناً بِهِ وَ ماتَ علىٰ الإِسْلَامِ***

*"সাহাবী হচ্ছেন তারা, যারা নবী কারীম (সা.) এর উপর ঈমান আনা অবস্থায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেনএবং ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন।"*

সাক্ষাতের পর প্রিয় নবীর সঙ্গে তাদের উঠা-বসা দীর্ঘ হোক অথবা স্বল্প হোক, তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করুক বা না করুক,তাঁর সাথে থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন বা করেন নি তারাও সাহাবী বলে গণ্য হবেন এমনকি ঈমান সহকারে তাঁকে একবার দেখার পর তার সঙ্গে উঠা-বসা না করলেও সহাবী বলে গন্য হবেন।

■ আর অন্ধের ক্ষেত্রে প্রিয়নবীর জীবদ্দশায় তার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হলেই তিনি সাহাবিদের মর্যাদা লাভ করবেন।

■ ঈমানের শর্ত লাগানোর কারনে কাফির অবস্থায় কেউ রাসূল (সা.) সাক্ষাৎ করলেও সাহাবী হতে পারবে না। এমনকি পরবর্তীতে ঈমান আনলেও যদি মুমিন অবস্থায় পুনরায় সাক্ষাৎ না হয়, তাহলেও এ মর্যাদা পাবেন না।

■ *আহলে কিতাবের মধ্যে যারা তাদের নবীর উপর ঈমান এনেছেন অথচ মুহাম্মদ (সা.)-* এর সাথে সাক্ষাৎ এর পর তাঁকে বিশ্বাস করেন নি তারা সাহাবী নন।

■ *পাদ্রী বাহিরা এবং তার মতো যারা* নবুয়তের পূর্বে রাসূল (সা.) - কে দেখেছেন এবং নবী হিসেবে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে বলে বিশ্বাস করেছেন তারা সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হবেন কিনা এ নিয়ে আলেমদের মাঝে ***দুটি মতভেদ বিদ্যমান।***

■ *জ্বীনদের মধ্যে যারা রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর উপর* ঈমান এনেছেন তারাও সাহবীর অন্তর্ভুক্ত হবেন।

■ *ফেরেশতাগণের মধ্যে* যাদের সাথে রাসূলের সাক্ষাৎ হয়েছে তারাও সাহবীর অন্তর্ভুক্ত হবেন কিনা এ নিয়ে ***দুইটি মত*** পাওয়া যায়।

■ যারা ঈমান সহকারে সাক্ষাৎ এর পর মুরতাদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে (নাউজুবিল্লাহ) যেমন, ***উম্মে হাবিবার*** পূর্বের স্বামী ***ওবায়দুল্লাহ বিন জাহশ ; আব্দুল্লাহ বিন খাতল; রাবিয়া বিন উমাইয়্যা বিন খালাফ*** সাহাবীদের তালিকা থেকে বাদ যাবে।

■ পক্ষান্তরে সাক্ষাৎ এর পর যেসব সাহাবীগণ মুরতাদ হয়ে পুনরায় মৃত্যুর পূর্বে ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছেন এবং রাসূলের সাথে দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ না করেই ইন্তেকাল করেছেন, বিশুদ্ধ মতে তারাও সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। ***যেমন: আশ-আস বিন কায়েছ,*** যিনি মুরতাদ হয়ে যাবার পর আবু বকর (রা.)-এর খিলাফাতের সময় ইসলামে ফিরে এসেছেন।উলামায়ে মুহাদ্দিসীন তাঁকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থসমূহে তার হাদীস বর্ণনা করেছেন। *ইমাম বুখারী এবং তার শায়েখ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)* এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

■ সাহাবী হবার জন্য কেউ কেউ সাক্ষাতের পাশাপাশি প্রাপ্ত বয়স্কতা এবং অল্প সময়ের জন্য হলেও সংশ্রবে থাকাকে শর্ত করেন। এটা কাঠিন্যের পর্যায়ে পড়ে যায়। আর যারা বিষয়টিকে উন্মুক্ত করে দিয়ে বলেন, *যারা নবী (সা.) কে দেখেছেন তারাই সাহাবী। – এক্ষেত্রে (سن التَّمْيِيْز) ভালোমন্দ বুঝার ও পার্থক্য করার বয়সে উপনীত হবার শর্ত থাকা বাঞ্ছনীয়।*

কারন যে এ বয়সে পৌঁছায় নি তার পক্ষে রাসূল (সা.) কে দেখা না দেখা সমান। তবে রাসূল (সা.) তাকে দেখেছেন এ হিসেবে তিনি সাহাবী। আর রিওয়ায়াতের দিক থেকে তিনি হবেন তাবেয়ী। আর যিনি রাসূল (সা.) কে মৃত অবস্থায় দাফনের পূর্বে দেখেছেন, যেমন কবি আবূ যুয়াইব আল-হুযালীর ক্ষেত্রে ঘটেছে। তিনি কি সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন? বিশুদ্ধ মতে না।

## ■ অধ্যায়-০৩) সাহাবীদের সংখ্যা ও চেনার উপায়ঃ

### ■ *সাহাবীদের সংখ্যাঃ*

*ইতিহাসবিদদের মতে, নবী মুহাম্মদ (সা.) সাহাবীদের সংখ্যা প্রায় **এক লক্ষেরও বেশি** ছিলো।*

■ *ইমাম আবু যর'আহ (রহ.) বলেন,*

*রাসূল (সা.) –এর বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা **এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার।***

এদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলামি শিক্ষার প্রচারে অন্যন্য অবদান রেখেছেন। যেমন, আবু বকর (রা.),আয়েশা (রা.), আনাস ইবনে মালিক (রা.) প্রমুখ।

### ■ *সাহাবী চেনার উপায়ঃ*

বিভিন্নভাবে সাহাবীদেরকে চিনা যায়। এতসংখ্যক বর্ণনাকারী একথা বলবেন যে,অমুক তিনি সাহাবী। মিথ্যার উপর যাদের একত্রিত হওয়া অসম্ভব। লোকমুখে সবাই তাকে সাহাবী হবার বিষয়টি ছড়িয়ে পড়বে,সবাই তাকে সাহাবী বলে জানবে।

■ কোনো সাহাবী থেকে এ মর্মে বর্ণনা থাকবে যে,অমুক ঈমান সহকারে রাসূলের সাহচর্য লাভ করেছেন।

■ নির্ভরযোগ্য কারো পক্ষ থেকে সমর্থন সহকারে একক তাবেয়ীর সাক্ষ্যও কোনো সাহাবীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ কোনো তাবেয়ী যদি এভাবে বর্ণনা করেন যে,অমুক আমাকে এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে,তিনি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছেন,... তাহলে এ ধরনের বক্তব্য সাহাবী হবার স্বপক্ষে প্রমাণ হতে পারে।

আর যদি বলেন,কোনো একজন আমাকে রাসূল (সা.) থেকে সংবাদ দিয়েছেন, এক্ষেত্রে ইরসালের সম্ভাবনা থাকায় সাহাবী হওয়ার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়বে।

এমনিভাবে যার সততা,ন্যায়পরায়নতা প্রমাণিত, নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত তিনি যদি বলেন, "আমি সাহাবী " –তাহলে তাকে সাহাবী বলে মেনে নেওয়া হবে।

## ■ অধ্যায়-০৪) কুরআনের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাঃ

*"সাহাবা (رضي الله عنهم)"* হলেন সেই মহান ব্যক্তিগণ যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁর থেকে ইসলাম শিক্ষা নিয়েছেন এবং ইসলাম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেছেন।কুরআনে সাহাবীদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা অন্য কোনো প্রজন্মের জন্য করা হয় নি।তাঁরা ছিলেন আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা,যারা নবী মুহাম্মদ (সা.) এর দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন।তাঁর সাথে সুখে-দুঃখে পাশে থেকেছেন এবং ইসলামের বিজয় ও প্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা কুরআনের বহু স্থানে সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন এবং

তাঁদের ত্যাগ, ঈমান ও মর্যাদা সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত নাযিল করেছেন।

■ আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে এমনভাবে সম্মানিত করেছেন যে, তাঁর সন্তুষ্টি তাঁদের প্রতি ঘোষণা করেছেন এবং তাঁদের অনুসরণকে সফলতার পথ বলেছেন।

■ *সাহাবিরা এমন এক প্রজন্ম, যাদের প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা করেছেন। তাঁরা ইসলামের প্রথম আলোকিত যুগের প্রতিনিধি।* ***কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,***

*مُحَمَّدٌ رَّسوْلُ اللهِ ،و الَّذيْنَ مَعَهٗ أَشِدَّاءُ على الْكُفَّارِ رُحماءُ بيْنَهُمْ ،ترٰهُم رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَ رِضْوٰناً، سيْماهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجودِ، ذٰلِكَ مَثَلُهم فِىْالتَّوْرٰةِ، وَ مَثَلُهُمْ فِى الإِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْءَهٗ فَأٰزَرَهٗ فَاْسْتَغْلَظَ فَاْسْتَوٰى على سوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكفَّارَ، وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ ءامَنُو وَعَمِلُو الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيْماً.*

***অর্থঃ "****মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকূকারী,সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে।তারা আল্লাহ তায়ালার করুণা ও সন্তুষ্টির অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইন্জিলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারা গাছের মতো, যে তার কচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কান্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে,যা চাষীকে আনন্দ দেয়।যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে,আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।"*
***(সূরা আল-ফাতহ্ আয়াত:২৯)***

■ এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সাহাবীদের ***০৪টি*** গুণাবলীর কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

***১)*** *অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোরতা (ইসলামের সুরক্ষায় দৃঢ়তা)*
***২)*** *মুসলমানদের প্রতি দয়া ও সৌহার্দ্য*
***৩)*** *নামাজে মনোযোগ ও খুশু-খুযু*
***৪)*** *আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা।*

এই ০৪ টি গুন মুসলিম সমাজের আদর্শ মানদণ্ড হিসেবে কুরআনে স্থির করা হয়েছে। অর্থাৎ, সাহাবীদের আদর্শই ইসলামী সমাজের নৈতিক ভিত্তি।

■ **পরিচ্ছদ-০১ঃ সাহাবীদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মর্যাদাঃ**

***এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আত-তাওবায় বলেছেন,***

***رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ و رَضُوْ عَنهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَداً ،ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.***

***অর্থাৎ, "আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্টি হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।এটাই মহাসাফল্য।"***
***(সূরা আত-তাওবাহ;আয়াত:১০০)***

***এছাড়াও সূরা বায়্যিনাহ এর ৮ নং আয়াতেও আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,***

***جَزَٰؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهآ أَبَداً ،رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْ عَنْهُ، ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ.***

***অর্থঃ*** *তাদের রবের কাছে তাদের পুরস্কার হবে স্থায়ী জান্নাত,যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা থাকবে স্থায়ীভাবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। এটি তার জন্য, যে স্বীয় রবকে ভয় করে।*

■ *এতে প্রমানিত হয় সাহাবারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন।*

**পরিচ্ছদ-০২ঃ সাহাবীদের ঈমান ও ত্যাগের প্রশংসাঃ**

*সাহাবীদের ঈমান ও ত্যাগ ছিলো অতুলনীয়।*

■ ***আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,***

***لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُواْ مِنْ دِيٰرِهِمْ وَ أَمْوٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَ رِضْوٰناً وَ يَنْصُرُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ، أُلٰٓءِكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ.***

***অর্থঃ*** এই সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরগণের জন্য ও যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পত্তি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিলো। অথচ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন।এরাই তো সত্যবাদী।

***(সূরা হাশর,আয়াতঃ০৮)***

এই আয়াতে সাহাবিদের ত্যাগ, ঈমান ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণের চিত্রফুটে উঠেছে। তাঁরা দুনিয়াবি স্বার্থ ত্যাগ করে ইসলাম রক্ষায় নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন।

■ ***অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,***

***وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّءُواْ الدَّارَ وَالاِيْمانَ مِنْ قَبْلِهُمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ اِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حاجَةً مِّمَّا أُتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُلٰٓءِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.***

***অর্থঃ***

"আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালবাসে। আর মুহাজরিদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করে না। এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।"

***(সূরা হাশরঃ ০৯ নং আয়াত)***

■ এই আয়াতটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই,
মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এ নগরী অর্থাৎ, মদীনাতে বসবাস করেছে ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করেনি বরং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হয়েও তারা (তাদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলো।কেননা আল্লাহ তা'য়ালাই তাদেরকে কার্পণ্য থেকে মুক্ত রেখেছেন।

আনসারী সাহাবী যাঁরা মুহাজির সাহাবাদের মদীনা আসার পূর্ব থেকেই মদীনার বাসিন্দা ছিলেন এবং মুহাজিরদের হিজরত করে মদীনা আসার পূর্বেই তাঁদের অন্তরে ঈমান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মুহাজির সাহাবাদের ঈমান আনার পূর্বেই আনসারী সাহাবাগণ ঈমান এনেছিলেন। কেননা, তাঁদের অধিকাংশই মুহাজির সাহাবাদের ঈমান আনার পর ঈমান এনেছেন। অর্থাৎ, مِنْ قَبْلِهِم (তাদের পূর্বে)এর অর্থ, مِنْ قَبْلِ هِجْرَتِهِم (তাঁদের হিজরত করার পূর্বে)। আর الدَار বলতে دَارُ الْهِجْرَة অর্থাৎ, মদীনাকে বুঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ, মুহাজির সাহাবীদেরকে আল্লাহর রসূল (সাঃ) যা কিছু দিতেন তাতে তাঁরা না হিংসা করতেন, আর না মনে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব করতেন। যেমন, 'মালে ফাই' পাওয়ার প্রথম অধিকারী তাঁদেরকেই গণ্য করা হয়। এতে আনসার সাহাবীগণ কিছুই মনে করেননি।

অর্থাৎ,আনসার সাহাবীরা নিজেদের তুলনায় মুহাজিরদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতেন। নিজেরা ক্ষুধার্ত থাকতেন, কিন্তু মুহাজিরদেরকে খাওয়াতেন।

■ ***যেমন, হাদীসে একটা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে,*** একদা নবী (সাঃ)-এর নিকট একজন মেহমান এল। কিন্তু রসূল (সাঃ)-এর ঘরে কিছুই ছিল না। সুতরাং একজন আনসারী সাহাবী তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে জানালে স্ত্রী বললেন, 'ঘরে তো কেবল ছেলেদের খাবার মত সামান্য কিছু আছে।' পরে উভয়ে পরামর্শ করলেন যে, ছেলেদেরকে আজ (ভুলিয়ে-ভালিয়ে) ক্ষুধার্ত রেখেই ঘুম পাড়িয়ে দাও এবং আমরা নিজেরাও কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে যাব। তবে মেহমানকে খাওয়ানোর সময় (ছল করে) বাতিটা নিভিয়ে দেবে, যাতে সে আমাদের ব্যাপারে জানতে না পারে যে, আমরা তার সাথে খাবার খাচ্ছি না। সকালে যখন এই সাহাবী রসূল (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন যে, মহান আল্লাহ তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে এই আয়াত ( وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم অবতীর্ণ করেছেন।

***(সূরা হাশরঃ০৯ নং আয়াত ও সহীহ বুখারীর তাফসীর)***

■ *আনসারী সাহাবীদের ত্যাগের  আরো একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত এও যে,*

একজন আনসারী সাহাবীর নিকট দু'জন স্ত্রী ছিল। তিনি তাঁর মুহাজির ভাইকে প্রস্তাব দিলেন যে, আমি তোমার জন্য আমার একজন স্ত্রীকে তালাক দেব। ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর তুমি তাকে বিবাহ করে নেবে! (বুখারী, বিবাহ অধ্যায়)

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সাহাবীদের ঈমান ও ত্যাগ ছিলো অতুলনীয়। বিশেষ করে  **বিশেষ করে আনসার সাহাবাদের নিঃস্বার্থতা ও উদারতা** প্রশংসিত হয়েছে। তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মুহাজির ভাইদের অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন– এটি ইসলামি ভ্রাতৃত্বের অনন্য উদাহরণ।

**পরিচ্ছদ-০৩ঃ সাহাবীদের ঈমানের দৃঢ়তা ও ত্যাগ:**

সাহাবায়ে কেরাম (رَضِيَ اللهُ عَنْهُم) ছিলেন ঈমানের প্রকৃত প্রতীক। তাঁরা শুধু মুখে ইসলাম গ্রহণ করেন নি– বরং হৃদয়,কর্ম এবং ত্যাগের মাধ্যমে ঈমানের প্রমাণ দিয়েছেন। কঠিনতম পরীক্ষার সময়েও তাঁদের ঈমান নড়েনি।কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের ঈমান, ধৈর্য ও আল্লাহর পথে দৃঢ় অবস্থানের প্রশংসা করেছেন

■ *আল্লাহ তা'য়ালা  বলেন,*

***ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جَمَعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِيمَٰنٗا وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِيلُ***

***অর্থঃ*** যাদেরকে মানুষেরা বলেছিল যে, 'নিশ্চয় লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় কর'। কিন্তু তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক'!

***(সূরা আলে-ইমরানঃ১৭৩ নং আয়াত)***

আয়াতটির তাফসীর দেখলে আমরা বিস্তারিতভাবে ঈমানের দৃঢ়তার বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হবো।

'হামরাউল আসাদ'  বলা হয় যে, 'বদর সুগরা'র সময়ে আবূ সুফিয়ান মালের বিনিময়ে কিছু মানুষের খিদমত গ্রহণ করে। সে তাদের মাধ্যমে গুজব রটায় যে, মক্কার মুশরিকগণ যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তার মূলত (আবূ সুফিয়ানের) উদ্দেশ্য ছিল, এ খবর শুনে মুসলিমদের উৎসাহ-উদ্দীপনা হ্রাস পাবে। কোন কোন বর্ণনা অনুয়াযী এই কাজ নাকি শয়তান তার সহচরদের দিয়ে করিয়েছিল। তবে এই ধরনের গুজব শুনে ভয় পাওয়ার পরিবর্তে মুসলিমদের উৎসাহ ও সংকল্প আরো বেড়ে যায়। যেটাকে এখানে 'ঈমান ও বিশ্বাস বর্ধিত করেছিল' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা ঈমান যত বলিষ্ঠ হবে, জিহাদের উদ্দীপনা ও সংকল্প ততই বৃদ্ধি পাবে। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈমান স্থির থাকবে এই ধরনের কোন জিনিস নয়, বরং তাতে কম-বেশী হতে থাকে। আর এটাই হল মুহাদ্দিসগণের মত। অনুরূপ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, পরীক্ষা ও বিপদের সময় মু'মিনদের নীতি হল, আল্লাহর উপর ভরসা করা।

■ **আর এই কারণেই হাদীসে حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْل পড়ার অনেক ফযীলত এসেছে। সহীহ বুখারীসহ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে** এসেছে যে, যখন ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তাঁর জবান দ্বারা এই (হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল) শব্দই উচ্চারিত হয়েছিলো এবং আল্লাহ তা'য়ালা আগুনকে তাঁর জন্য শুধু ঠান্ডাই করেন নি বরং আরামদায়ক করে দিয়েছিলেন।

**(ফাতহুল ক্বাদীর)**

***■ আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের আরেক আয়াতে বলেন,***

***ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ أَعۡظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ***

***অর্থঃ*** যারা ঈমান এনেছে, (দ্বীনের জন্য স্বদেশত্যাগ) হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর নিকট মর্যাদায় বড়,আর তারাই হল সফলকাম।

***(সূরা আত-তাওবাহঃ ২০ নং আয়াত)***

এই আয়াতটিতে সাহাবিদের আত্মত্যাগ ও আল্লাহর পথে সংগ্রামকে সম্মানিত করেছে।তাঁরা শুধু মুখে ঈমান আনেন নি বরং সম্পদ ও জীবন ও উৎসর্গ করেছেন দ্বীনের জন্য।

***■ অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,***

***وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا***

***অর্থঃ*** *আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম।*

***(সূরা নিসাঃ ৬৯ নং আয়াত)***

এই আয়াতটিতেও সাহাবীদের মর্যাদা নির্দেশ করে, কারন তাঁরা নবীর পরে সবচেয়ে নিকট মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি–সত্যবাদী,শহীদ ও সৎকর্মশীল।আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করার প্রতিদানের কথাও বলা হয়েছে।

■ ***হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,***

***(الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ) "মানুষ তার সাথে থাকবে, যাকে সে ভালোবাসে।"***

***(বুখারী ৬১৬৮, মুসলিম ২৬৪১নং)***

■ ***আনাস (রাঃ) বলেন,*** রসূল (সাঃ)-এর এই কথা শুনে সাহাবাগণ যত আনন্দিত হয়েছিলেন এত আনন্দিত আর কখনও হন নি। কারণ, তাঁরা জান্নাতেও রসূল (সাঃ-এর সঙ্গ লাভ চাইতেন।

■ ***আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,*** কোন কোন সাহাবী নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট আরজ করলেন যে, মহান আল্লাহ আপনাকে জান্নাতে সর্বোচ্চ স্থান দান করবেন। আর আমরা তার থেকে নিম্নস্তরের স্থানই লাভ করব এবং এইভাবে আমরা আপনার সঙ্গ-সংসর্গ এবং আপনার দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত থাকব, যা দুনিয়াতে আমরা পাই। তাই আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিলেন।

***(তাফসীরঃইবনে কাসীর)***

■ কোন কোন সাহাবী তো বিশেষভাবে রসূল (সাঃ)-এর সাথে জান্নাতে থাকার দরখাস্ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন (**أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ**)

আর এর জন্য রসূল (সাঃ) তাদেরকে বেশী বেশী নফল নামায পড়ার তাকীদ করেছিলেন।

***(فَأَعِنِّي عَلى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْد) "তুমি বেশী বেশী সিজদা করে আমার সাহায্য কর।" (মুসলিম ৪৮৯নং)***

■ ***এ ছাড়া আরো একটি হাদীসে এসেছে যে, التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِين مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء***

***"***সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী আম্বিয়া, সিদ্দীক এবং শহীদদের সাথে থাকবে।***" (তিরমিযী ১২০৯নং)***

■ ***আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের অন্য আরেকটি আয়াতে বলেন,***

***وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡ كَفَّرَ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡ وَأَصۡلَحَ بَالَهُمۡ***

***অর্থঃ*** *"আর যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে 'আর তা তাদের রবের পক্ষ হতে (প্রেরিত) সত্য, তিনি তাদের থেকে তাদের মন্দ কাজগুলো দূর করে দেবেন এবং তিনি তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন।"*

***(সূরা মুহাম্মদঃ ০২ নং আয়াত)***

***এই আয়াতটির তাফসীর থেকে আমরা দেখতে পাই,*** বিশ্বাস ও ঈমান আনার মধ্যে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি প্রেরিত অহী অর্থাৎ, পবিত্র কুরআনের উপর ঈমান আনাও শামিল, তবুও এর গুরুত্ব ও মর্যাদাকে আরো বেশী সুস্পষ্ট করার জন্য এটাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থাৎ ঈমান আনার পূর্বেকার ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেন।

***যেমন, নবী করীম (সাঃ)ও বলেছেন, "ইসলাম পূর্বেকার যাবতীয় পাপকে মুছে দেয়।" (সহীহুল জামে', আলবানী)***

***بَالَهُم এর অর্থ أَمْرَهُمْ، شَأْنَهُمْ، حَالَهُم***

***এগুলোর অর্থ প্রায় একই ধরণের।***

***অর্থাৎ, তাদেরকে পাপাচার থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করেছেন।*** আর একজন মু'মিনের জন্য অবস্থা ভালো হওয়ার এটাই সর্বোত্তম চিত্র। এর অর্থ এই নয়

যে, ধন-সম্পদের মাধ্যমে তাদের অবস্থা ভালো করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, সকল মু'মিন ধন-সম্পদ পায় না। তাছাড়া পার্থিব ধন-সম্পদ লাভ অবস্থা ভাল হওয়ার সুনিশ্চিত প্রমাণও নয়। বরং এতে অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশী থাকে। এই জন্য নবী করীম (সাঃ) অধিক মাল পছন্দ করতেন না।

***সংক্ষেপে বলতে গেলে,*** এই আয়াতটিও সাহাবীদের প্রসঙ্গে নাযিল করা হয়েছিলো।যারা রাসূল (সা.) এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁর সাথে সৎকর্মে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

**এই পরিচ্ছদের আয়াতগুলোতে** দেখা যায় সাহাবারা (ْرَضِيَ اللهُ عَنْهُم )

***১)*** ভয় ও কষ্টের মাঝেও ঈমান দৃঢ় রেখেছেন।

***২)*** আল্লাহ ও  রাসূলের জন্য প্রাণ ও সম্পদ উৎসর্গ করেছেন।

***৩)*** নবীদের পরে সবচেয়ে উত্তম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

***৪)*** ঈমানের কারনে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করেছেন ও শান্তি দান করেছেন।

**পরিচ্ছদ-০৪ঃ সাহাবিদের অনুসরণে হিদায়াত ও সফলতা:**

■ আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে ঘোষণা করেছেন, "সাহাবিদের পথই হচ্ছে সঠিক পথ।" তাঁদের অনুসরণ করাই হিদায়াত (সত্য পথ) লাভের একমাত্র উপায়। তাঁরা আল্লাহর রাসূল (সা.) এর কাছ থেকে সরাসরি কুরআন শিক্ষা পেয়েছিলেন, তাই তাঁদের ঈমান ও আমল ছিলো সর্বোত্তম।আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে তাঁদের অনুসরণকারীদের জন্যও সফলতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

***আল্লাহ তা'য়ালা  বলেন,***

***فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَواْۖ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ***

***অর্থঃ*** "অতএব যদি তারা ঈমান আনে, তোমরা যেরূপে তার প্রতি ঈমান এনেছ, তবে অবশ্যই তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা বিমুখ হয় তাহলে তারা রয়েছে কেবল বিরোধিতায়, তাই তাদের বিপক্ষে তোমার জন্য আল্লাহ  যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

***(সূরা বাক্বারাহঃ ১৩৭ নং আয়াত)***

আয়াতটিতে ***"তোমরা"*** বলতে রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে সাহাবারা ঈমান এনেছিলো সেইভাবে ঈমান আনলেই মানুষ হিদায়াত পাবে।**তাঁদের ঈমানই ছিলো প্রকৃত ইসলামি ঈমানের মানদণ্ড।"**

■ আমরা এই আয়াতের শানে নুযূল এবং তাফসীরে দেখতে পাই,

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)গণ কুরআনে উল্লিখিত এই নিয়মেই ঈমান এনেছিলেন। এই জন্যই তাঁদের দৃষ্টান্ত পেশ করে বলা হচ্ছে যে, তারা যদি ঐভাবেই ঈমান আনে, যেভাবে হে সাহাবাগণ! তোমরা ঈমান এনেছ, তাহলে অবশ্যই তারা হিদায়াত লাভ করবে। কিন্তু তারা যদি হঠকারিতা ও বিরোধিতার পথ অবলম্বন করে, তবে তাতে ঘাবড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই তাদের চক্রান্তসমূহ (হে নবী) তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ, তাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট।

■ বলা বাহুল্য, কয়েক বছরের মধ্যেই এই অঙ্গীকার বাস্তব রূপ পেল। ***বানু-ক্বায়নুক্বা' ও বানু-নাযীরকে*** দেশ থেকে বহিষ্কার করা এবং বানু-ক্বুরায়যাকে হত্যা করা হল।

■ ***ইতিহাসের বর্ণনায় এসেছে যে,***
***উসমান (রাঃ)-কে*** শহীদ করার সময় একটি কুরআন তাঁর কোলেই ছিল এবং তাতে লিখিত এই ***{فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ} আয়াতে তাঁর রক্তের*** ছিটা পড়েছিল।

■ ***বলা হয়,*** কুরআনের সে কপিটি আজও ***"তুরস্কের যাদুঘরে"*** সংরক্ষিত আছে।

***আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের অন্য আরেকটি আয়াতে বলেন,***

***وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا***

***অর্থঃ*** "আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ।"

*(সূরা নিসাঃ ১১৫ নং আয়াত)*

**আয়াতের শানে নুযূল এবং তাফসীর থেকে দেখতে পাই যে,** এখানে বলা হয়েছে–**যে সাহাবিদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়**, সে বিভ্রান্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই ঘোষণা করেছেন মু'মিনদের পথ ত্যাগ করা জাহান্নামের পথ।

হিদায়াতের পথ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর রসূল (সাঃ)-এর বিরোধিতা এবং মু'মিনদের পথ ত্যাগ করে অন্য পথের অনুসরণ করা ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার নামান্তর এবং এ ব্যাপারেই জাহান্নামের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

- **মু'মিনীন বলতে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-দের** বুঝানো হয়েছে। যাঁরা হলেন সর্বপ্রথম ইসলামের অনুসারী এবং ইসলামী শিক্ষার পরিপূর্ণ নমুনা।
- এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁরা ব্যতীত অন্য কোন মু'মিনীন বিদ্যমানও ছিলেন না যে তাঁরা লক্ষ্য হতে পারেন।

কাজেই রসূল (সাঃ)-এর বিরোধিতা এবং সাহাবা (রাঃ)-দের পথ ত্যাগ করে অন্য পথের অনুসরণ করা দুটোই প্রকৃতপক্ষে একই জিনিসের নাম। এই জন্য সাহাবায়ে কেরামদের পথ থেকে বিচ্যুতিও কুফরী ও ভ্রষ্টতা।

- কোন কোন উলামা মু'মিনীনদের পথ বলতে উম্মতের ঐক্য (ইজমা বা সর্ববাদিসম্মতি)-কে বুঝিয়েছেন।

অর্থাৎ, উম্মতের কোন বিষয়ে ঐকমত্য প্রত্যাখ্যান করাও কুফরী।
আর **উম্মতের ঐকমত্যের অর্থ হল,**

**"কোন মাসলায় উম্মতের সমস্ত আলেম ও ফিক্বাহবিদের ঐকমত্য প্রকাশ করা।"**

**অথবা**, কোন বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের ঐক্য হওয়া। উভয় অবস্থায়ই উম্মতের ঐক্য বলে গণ্য এবং এই উভয় ঐক্যের অথবা তার কোন একটির অস্বীকার করা হবে কুফরী।

- তবে সাহাবায়ে কেরামদের ঐকমত্য তো অনেক মাসলায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এই প্রকারের ঐক্য তো লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সাহাবায়ে কেরামদের ঐক্যের পর সমস্ত উম্মতের বহু বিষয়ে ঐকমত্যের দাবী করা হলেও বাস্তবে এ রকম মাসলা-মাসায়েলের সংখ্যা অনেক

কম, যে ব্যাপারে উম্মতের সমস্ত উলামা ও ফুক্বাহা (ফিক্বাহ শাস্ত্রের পন্ডিতগণ) ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন।

■ স্বল্প সংখ্যায় হলেও যে ব্যাপারে উম্মতের ঐক্য হয়েছে তার অস্বীকৃতিও সাহাবায়ে কেরামদের ঐক্যের অস্বীকৃতির মতই কুফরী।

কারণ, **সহীহ হাদীসে এসেছে যে,**

"মহান আল্লাহ আমার উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না এবং জামাআতের উপর থাকে আল্লাহর হাত।"

**(সহীহ তিরমিযী, আলবানী*১৭৫৯ নং)***

■ **আল্লাহ তা'য়ালা সূরা বায়্যিনাহর ০৮ নং আয়াতে বলেন,**

**رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ رَبَّهُۥ**

**অর্থঃ** “আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। এটি তার জন্য, যে স্বীয় রবকে ভয় করে।”

**আয়াতটির তাফসীরে আমরা দেখতে পাই যে,**

তাদের (অর্থাৎ সাহাবীদের) **ঈমান, আনুগত্য এবং সৎকর্মের** কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হল সব থেকে বড় জিনিস।

**মহান আল্লাহ বলেন, (وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكبَر) (সূরা তাওবাহ ৯:৭২ আয়াত)**

এ জন্য যে, আল্লাহ তাদেরকে এমন সব নিয়ামতের অধিকারী বানিয়েছেন; যার মধ্যে তাদের আত্মা ও দেহ উভয়ের সুখ বিদ্যমান।

উত্তম প্রতিদান ও সন্তুষ্টি ঐ সকল লোকদের জন্য, যারা পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করে চলে। আর সেই ভয়ের কারণে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করা হতে দূরে থাকে। যদি কোন সময় মানব

মনের প্রবণতায় পাপ হয়েই যায়, তাহলে তারা সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়।

**পরিশেষে তাদের মৃত্যু এই অনুগত থাকা অবস্থাতেই হয়; অবাধ্য থাকা অবস্থায় নয়। এর ফলকথা এই যে, আল্লাহর ভয়ে ভীত মানুষ তাঁর অবাধ্যাচরণে অবিচল থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে যে এরূপ করে, আসলে তার হৃদয় আল্লাহর ভয় থেকে শূন্য।**

**এই পরিচ্ছদের আয়াতগুলো থেকে দেখা যায় সাহাবারা (رَضِيَ اللهُ عَنْهُم)--**

**১)** সাহাবীদের ঈমানই প্রকৃত ঈমান-তাদের মতো বিশ্বাস করতে পারলে আমরাও হিদায়াত পাবো।

**২)** সাহাবীদের পথ পরিত্যাগ করা বিভ্রান্তি ও জাহান্নামের কারন।

**৩)** সাহাবীদের অনুসরণে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের প্রতিশ্রুতি।

**৪)** কুরআনে সাহাবীদের পথকে "সাবিলুল মু'মিনিন" বলে অভিহিত করেছেন, যা ইসলামের আসল মানদণ্ড।

***পরিচ্ছদ-০৫ঃ সাহাবীদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি ও তাঁদের পরকালীন মর্যাদা:***

■ সাহাবা (رَضِيَ اللهُ عَنْهُم) ছিলেন ইসলামের প্রথম প্রজন্ম, যারা রাসূল (সা.)- এর সান্নিধ্যে থেকে ঈমান,জিহাদ,ত্যাগ ও ইখলাসের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং নবীদের পরে তাঁদের সর্বোচ্চ মর্যাদা ঘোষণা করেছেন।

■ তাঁদের ঈমান ও কর্মের পুরস্কার কেবল দুনিয়ায় নয় বরং আখিরাতে জান্নাত লাভ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

■ **আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে বলেন,**

***رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ و ◌ رضُوْ عَنهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي تَحْتَها الأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَداً ،ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.***

***অর্থাৎ,*** "আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্টি হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।এটাই মহাসাফল্য।*"*

***(সূরা আত-তাওবাহঃ ১০০ নং আয়াত)***

**আমরা এই আয়াতটির তাফসীর থেকে দেখতে পাই যে,**

■ **'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট'** বাক্যটির অর্থ হল, আল্লাহ তাআলা তাঁদের সৎকর্ম গ্রহণ করেছেন, মানুষ হিসাবে তাঁদের কৃত ভুল-ক্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তিনি তাঁদের উপর অসন্তুষ্ট নন। যদি তা না হত, তাহলে উক্ত আয়াতে তাঁদের জন্য জান্নাত ও জান্নাতের নিয়ামতের সুসংবাদ দেওয়া হল কেন? এই আয়াত দ্বারা এটাও জানা গেল যে, আল্লাহর এই সন্তুষ্টি সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী নয়, বরং চিরস্থায়ী।

**যদি রসূল (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কিরামগণের মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত (যেমন এক বাতিল ফির্কার বিশ্বাস আছে), তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন না।**

এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, যখন আল্লাহ তাআলা তাঁদের সমস্ত ক্রুটি মার্জনা করে দিয়েছেন, তখন তাঁদের সমালোচনা করে তাঁদের ভুল-ক্রুটি বর্ণনা করা কোন মুসলিমের উচিত নয়।

**বস্তুতঃ** এটাও জানা গেল যে, তাঁদের প্রতি মহব্বত রাখা এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ। আর তাঁদের প্রতি শত্রুতা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করা আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ।

**{فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون}**◌

**সংক্ষেপে** বল্লে এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা সাহাবীদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন তাই তাঁদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাত নিশ্চিত।

■ **আল্লাহ তা'য়ালা** কুরআনের আরেকটি আয়াতে বলেন,

***لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا***

***অর্থঃ*** *"*অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কী ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে।*"*

*(সূরা ফাতহ্ঃ ০৮ নং আয়াত)*

এই আয়াতটিতে **"বাই'আতুর রিদওয়ান"** নামে পরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি সাহাবিদের জন্য এক অনন্য সম্মান —কারন আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন,যে তিনি তাঁদের অন্তরের ঈমান ও আন্তরিকতায় সন্তুষ্ট।

আয়াতটির তাফসীর থেকে আমরা বিষয়টি আরও স্পষ্ট জানতে পারি যে,

■ বাইয়াতে রিযওয়ানে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, এখানে তাঁদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্ট হওয়ার এবং তাঁদের পাকা ও খাঁটি মু'মিন হওয়ার সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা হুদাইবিয়ায় এক গাছের নীচে শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁরা মক্কার কুরাইশদের সাথে লড়বেন এবং পলায়নের পথ অবলম্বন করবেন না।

অর্থাৎ, তাঁদের অন্তরে যে সত্যতা ও নির্মলতার আবেগ ছিল, সে ব্যাপারেও আল্লাহ অবগত আছেন।

তাঁরা ছিলেন নিরস্ত্র। যুদ্ধের নিয়তে যেহেতু তাঁরা যায়নি, তাই সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র ছিল না। তা সত্ত্বেও যখন নবী করীম (সাঃ) উসমান (রাঃ)-এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করেন, তখন সামান্য পরিমাণও কোন দ্বিধা না করে সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের অন্তরের ঈমান ও আন্তরিকতায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁদের অন্তর থেকে মৃত্যুর আশঙ্কা দূর করে দিলেন এবং তার পরিবর্তে ধৈর্য ও প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন। যার ফলে তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ করার প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি হল এবং তারা বিজয়ীও হলো।

■ *আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের আরেকটি আয়াতে বলেন,*

وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰ *(সূরা নিসাঃ ৯৫ নং আয়াত)*

***অর্থঃ*** *"*আর আল্লাহ প্রত্যেককেই(সাহাবীদের জন্য) কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।*"*

*আয়াতটির তাফসীর থেকে আমরা দেখতে পাই, (كُلًّا সকলের জন্য) শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে– যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া সাহাবী হোক বা ঘরে থেকে সাহায্য করা সাহাবী হোক, উভয়ের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।*

■ *আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,*

يَوۡمَ لَا يُخۡزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥۖ نُورُهُمۡ يَسۡعَىٰ بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَبِأَيۡمَٰنِهِمۡ □

***অর্থঃ*** *"*সেদিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ নবী ও তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে এমন ব্যক্তিদের অপমান করবেন না। তাদের নূর (আলো) তাদের সামনে ও ডান দিকে ছুটে চলবে।*"* **(সূরা আত-তাহরীমঃ ০৮ নং আয়াত)**

এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামত দিনের দৃশ্য তুলে ধরেছেন,যেখানে রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাহাবিরা সম্মানের সঙ্গে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন। তাঁদের মুখ ও হৃদয়ে নূর (আলো) থাকবে–এটি জান্নাতে তাঁদের মর্যাদার প্রতীক।

■ *আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে বলেন,*

**جَنَّٰتُ عَدۡنٍ يَدۡخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابَآئِهِمۡ وَأَزۡوَٰجِهِمۡ وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُونَ عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ بَابٍ**

**অর্থঃ "***স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাতে তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষগণ, তাদের স্ত্রীগণ ও তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সৎ ছিল তারা প্রবেশ করবে। আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে।* **(সূরা রা'দঃ ২৩নং আয়াত)**

■ আয়াতটির তাফসীর থেকে আমরা দেখতে পাই,

**'আদন' এর অর্থ হলো স্থায়ী অর্থাৎ চিরস্থায়ী বাগান।**

অর্থাৎ, এমনিভাবে সৎশীল (জান্নাতী) আত্মীয়দেরকে পরস্পর একত্র করে দেবেন, যাতে এদেরকে দেখে তাদের চক্ষু শীতল হয়। এমনকি নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতীদের উচ্চ শ্রেণীর মর্যাদা দান করবেন, যাতে তারা সব আত্মীয়ের সাথে একত্রিত হতে পারে।

**মহান আল্লাহ বলেন,**

**وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَمَآ أَلَتۡنَٰهُم مِّنۡ عَمَلِهِم مِّن شَيۡءٖۚ كُلُّ ٱمۡرِيِٕۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٞ**

**অর্থাৎ**, যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করব না। **(সূরা তূ-র ৫২:২১)**

এখান থেকে যেমন এটা জানা গেল যে, মহান আল্লাহ আত্মীয়দেরকে জান্নাতে একত্র করে দেবেন, তেমন এটাও জানা গেল যে, যদি কারো কাছে ঈমান ও সৎ আমলের সম্বল না থাকে তাহলে সে জান্নাতে যাবে না, যদিও তার অন্যান্য অত্যন্ত নিকটাত্মীয় জান্নাতে চলে যায়। কেননা জান্নাতে প্রবেশ জাত-কূলের ভিত্তিতে হয় না, বরং ঈমান ও সৎ আমলের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

■ **মহানবী (সাঃ) বলেন,** *"যাকে তার আমল পিছে ছেড়ে দেয়, তার বংশ তাকে সামনে বাড়াবে না।" (মুসলিম)*

**অর্থাৎ,** সাহাবীদের জান্নাতে পরিবারসহ (যদি না তারা কোনো শিরক করে থাকে) সম্মিলিত মর্যাদা দেওয়া হবে--কারন তাঁদের ঈমান ও আমল ছিলো পরিপূর্ণ।

**সাহাবারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত এক দল মানুষ।** তাঁরা নবী (সা.) এর পাশে থেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং নবীদের পরেই তাঁদের স্থান ঘোষণা করেছেন।

## ■ অধ্যায়-০৬ঃ হাদিসের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা:

**সাহাবীদের** প্রতি ভালোবাসা, সম্মান ও আনুগত্য শুধু কুরআনের নির্দেশেই সীমাবদ্ধ নয় ; বরং রাসূল (সা.) নিজেই তাঁদের মর্যাদা ও গুণাবলী সম্পর্কে অসংখ্য হাদীসে আলোকপাত করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন – সাহাবীদের ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শন, আর তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ কুফরির লক্ষণ। নবীজির হাদিসগুলোতে সাহাবীদের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁদের অনুসরণের গুরুত্ব, তাঁদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ এবং তাঁদের জীবনের আদর্শের প্রতি অনুপ্রেরণার স্পষ্ট বার্তা পাওয়া যায়।

হাদীসের গ্রন্থসমূহে সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে।নিচে কয়েকটি হাদিস তুলে ধরা হলো:-

### ■ প্রচ্ছদ-০১ঃ সাহাবীরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আদর্শ:

**■ আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত:**

***حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَكَانُوْا يَضْرِبُوْنَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ***

*অর্থঃ "নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,* আমার উম্মাতের সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ (সাহাবীগণ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। অতঃপর এমন লোকদের আগমন হবে যাদের কেউ সাক্ষ্য দানের পূর্বে কসম এবং কসমের পূর্বে সাক্ষ্য দান করবে। ইব্রাহীম (নাখ্য়ী; রাবী) বলেন, ছোট বেলায় আমাদের মুরুব্বীগণ আল্লাহ্‌র নামে কসম করে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য এবং ওয়াদা-অঙ্গীকার করার কারণে আমাদেরকে মারধর করতেন।*"*

*(সহিহ বুখারী: ৩৬৫১ ; সহীহ মুসলিম,হাদীস নং ২৫৩৩)*

- *হাদিসের মান: সহিহ হাদিস*

**ব্যাখ্যাঃ** এই হাদীস দ্বারা রাসূল (সা.) সাহাবাদের যুগকে সর্বোত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। পরবর্তীতে তাবেঈন-তাবেতাবেঈনদের যুগকেও শ্রেষ্ঠতার ক্রমে স্থান দিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে সাহাবারা ইসলামী উম্মাহর মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

- **আরেক হাদীসে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিতঃ**

***حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَسُبُّوْا حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُم أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ تَابَعَهُ جَرِيْرٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَمُحَاضِرٌ عَنْ الأَعْمَشِ***

***অর্থঃ*** “তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ কর না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমান সোনা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ সওয়াব হবে না। জারীর আবদুল্লাহ ইবনু দাউদ, আবূ মু’আবিয়াহ ও মুহাযির (রহঃ) আ’মাশ (রহঃ) হতে হাদীস বর্ণনায় শুবা (রহঃ)-এর অনুসরণ করেছেন।*”*

***(আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৩৯৮, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৩৪০৫)***
***(সহিহ বুখারী:৩৬৭৩; সহীহ মুসলিম: ২৫৪১)***

***ব্যাখ্যাঃ*** এই হাদীসে সাহাবীদের তুলনাহীন মর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে। রাসূল (সা.) এর সাহচর্য,ত্যাগ ও আত্মনিবেদন এমন এক স্তরে পৌঁছেছে, যা কোনো পরবর্তী প্রজন্মের কেউ উপার্জন করতে পারবে না।

- **প্রচ্ছদ-০২ঃ সাহাবীরা উম্মতের জন্য নিরাপত্তা:**

- **রাসূল (সা.) বলেন,**

***" النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ" .***

***অর্থঃ “***তারকারাজি অবস্থানের কারণেই আকাশ স্থিতিশীল রয়েছে। তারকারাজি যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে তখন আকাশের জন্য ওয়া’দাকৃত বিপদ আসন্ন হবে (অর্থ্যাৎ- কিয়ামাত এসে যাবে এবং আসমান ফেটে চৌচির হয়ে যাবে)। আর আমি আমার সাহাবাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা স্বরুপ। আমি যখন বিদায় নিব তখন আমার সাহাবাদের উপর ওয়া’দাকৃত সময় এসে সমুপস্থিত হয়ে যাবে (অর্থ্যাৎ - ফিতনা-ফাসাদ ও দ্বন্দ সংঘাত লেগে যাবে)। আর আমার সাহাবাগণ সকল উন্মাতের জন্য  রক্ষাকবচ স্বরুপ। আমার সাহাবীগণ যখন বিদায় হয়ে যাবে তখন আমার উন্মাতের উপর ওয়া’দাকৃত বিষয় উপস্থিত হবে।***”***

**অর্থ্যাৎ** - শিরক, বিদ’আত ছড়িয়ে পড়বে, ফিতনাহ-ফাসাদের আর্বিভাব হবে, শাইতানের শিঙ উদয় হবে, নাসারাদের রাজত্ব কায়েম হবে, মাক্কাহ ও মাদীনার অবমাননা করা হবে।, বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে ইত্যাদি। (**ইমাম নাবাবী**)

**(সহিহ মুসলিম: ৬৩৬০)**
**(হাদিসের মান: সহিহ হাদিস)**

***ব্যাখ্যাঃ*** নবী রাসূল (সা.) এই হাদীসে সাহাবীদেরকে উম্মতের জন্য “নিরাপত্তার প্রতীক” হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের জীবন ও উপস্থিতি যতদিন ছিলো, ততদিন উম্মাহ বিভেদ ও ফিতনা থেকে সুরক্ষিত ছিলো। তাঁদের মৃত্যুর পর ফিতনা-ফাসাদ বৃদ্ধি পাওয়া নবীর ভবিষ্যৎ বাণী ছিলো।

■ **প্রচ্ছদ-০৩ঃ সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অংশ ও নিদর্শন:**

***حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ "***

**আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ**

**অর্থঃ** নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ “ঈমানের আলামত হল আনসারকে ভালবাসা এবং মুনাফিকীর চিহ্ন হল আনসারের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা।”

(৩৭৮৪; মুসলিম ১/৩৩ হাঃ ৭৪, আহমাদ ১৩৬০৮) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৬, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ১৬)

**(সহিহ বুখারী: ১৭)**
**(হাদিসের মান: সহিহ হাদিস)**

**ব্যাখ্যাঃ** এই হাদিসটি শুধু আনসারদের জন্য নয়, বরং সব সাহাবীদের ভালোবাসার গুরুত্বের দিকে ইঙ্গিত করে। রাসূল (সা.) স্পষ্ট বলেছেন – যে সাহাবীদের ভালোবাসে সে প্রকৃত মু'মিন। আর যারা তাঁদের ঘৃণা করে, তারা মুনাফিক।

- ***রাসূল (সা.) বলেছেন,***

*“ আমার সাহাবীদের ভালোবাসবে কেবল মু'মিন,আর তাদের ঘৃণা করবে কেবল মুনাফিক।”*
***(সহীহ মুসলিমঃ ২৫০)***

***এই হাদীসটি*** *অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। “নবীজীর এই ঘোষণা অনুসারে, সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা রাখাই ঈমানের চিহ্ন। যে ব্যক্তি সাহাবীদের অবমাননা করে, তার ঈমানের অস্তিত্ব সন্দেহজনক।”*

- ***রাসূল (সা.) বলেছেন,***

***اللهُ اللهُ فِيْ اَصْحَابِ ،لَا تَتَّخِذُوْ هُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِيْ، فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبْحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَ مَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ. وَ مَنْ اَذَا هُمْ فَقَدْ اَذَا نِىْ وَ مَنْ اَذَانِىْ فَقَدْ اَذَى الله فَيُوْشِكُ اَنْ يَّأْخُذَهُ.***

***অর্থঃ** সাবধান! সাবধান আমার সাহাবীদের ব্যাপারে,আমার পরে তাদের সমালোচনার ক্ষেত্র বানিও না। যে ব্যক্তি তাঁদের মুহাব্বত করল,সে প্রকৃতপক্ষে আমাকে মুহাব্বতের কারনেই তাঁদের মুহাব্বত করলো।যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো সে মূলত আমার প্রতি বিদ্বেষের কারনে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো। যে ব্যক্তি তাঁদের কাউকে কষ্ট দিলো সে আমাকেই কষ্ট দিলো। যে আমাকে কষ্ট দিলো, সে আল্লাহকে কষ্ট দিলো। যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দিবে শীগ্রই আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।*
*—**(তিরমিজি, মুসনাদ আহমাদ)***

**"যে ব্যক্তি** তাঁদের মুহাব্বত করল,প্রকৃতপক্ষে আমাকে মুহাব্বতের কারনেই সে তাঁদের মুহাব্বত করলো"--- **বাক্যটির ০২ টি ব্যাখ্যা রয়েছে:-**

**০১)** সাহাবীদের প্রতি মুহাব্বত-ভালোবাসা, আমার প্রতি মুহাব্বত-ভালোবাসার আলামত, অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই তাঁদের ভালোবাসে যার অন্তরে আমার প্রতি ভালোবাসা আছে।

**০২)** যে ব্যক্তি আমার কোনো সাহাবীকে ভালোবাসে, এর অর্থ সেই ব্যক্তির প্রতি আমি মুহাম্মদের ভালোবাসা রয়েছে। একই ব্যাখ্যা বিদ্বেষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হোক এই হাদীস তাঁদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক সংকেত, যারা সাহাবায়ে কেরামকে স্বাধীনভাবে যথেষ্ট সমালোচনার লক্ষ বানিয়ে থাকেন,তাঁদের ব্যাপারে এমন এমন কথা বলেন বা লিখেন যার কারনে শ্রোতা বা পাঠক তাঁদের ব্যাপারে আস্থা, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সাহাবীদের সমালোচনা করা প্রিয় নবীর নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সমতুল্য।

■ ***অন্য আরেকটি হাদিসে বলেছেন,***

*" আমার সাহাবীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো। তাঁদের পরে এসে কেউ যেনো তাঁদের সম্পর্কে খারাপ কথা না বলে।"*
***--(তিরমিজি)***

***অর্থঃ** সাহাবীদের সমালোচনা  করা বা তাঁদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ।*

■ ***হযরত আলী (রা.) বলেন,***

" যে ব্যক্তি সাহাবীদের ভালোবাসবে, সে নবীর প্রতি ভালোবাসা রাখে; আর যে তাঁদের ঘৃণা করবে, সে নবীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।"

***(ইবনু আব্দুল বার,আল-ইস্তিজকার খন্ড-০১)***

■ **প্রচ্ছদ-০৪ঃ সাহাবীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের পরিণতি:**

■ **রাসূল (সা.) বলেছেন,**

*"যে আমার সাহাবীদের গালি দেয়, তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের ও সমগ্র মানবজাতির লানত বর্ষিত হোক।"*

***( তাবারানী,আল-মু'জাম আল-কাবীর, হাদীস ১৪২৬৮; সহীহ সনদে বর্ণিত)***

***এই*** *হাদীসের মাধ্যমে নবীজী অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সাহাবীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বা অবমাননাকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।*

■ ***প্রচ্ছদ-০৫ঃ সাহাবীদের অনুসরণের নির্দেশ:***

***حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ السَّلَمِيِّ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا بَعْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلاَلَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.*** 

***وَقَدْ رَوَى ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ وَالْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ يُكْنَى أَبَا نَجِيحٍ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حُجْرِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَه.***

**ইরবায ইবনু সারিয়াহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ**

**তিনি বলেন,** রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন ফজরের নামাযের পর আমাদেরকে মর্মস্পর্শী ওয়াজ শুনালেন, যাতে (আমাদের) সকলের চোখে পানি এলো এবং অন্তর কেপে উঠলো। কোন একজন বলল, এ তো বিদায়ী ব্যক্তির নাসীহাতের মতো।

**হে আল্লাহর** রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এখন আপনি আমাদেরকে কি উপদেশ দিচ্ছেন? **তিনি বললেনঃ**

**“আমি তোমাদেরকে** আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করার এবং (নেতার আদেশ) শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (নেতা) হাবশী ক্রীতদাস হয়ে থাকে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা বহু বিভেদ-বিসম্বাদ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করা হতে দূরে থাকবে। কেননা তা গুমরাহী। তোমাদের মধ্যে কেউ সে যুগ পেলে সে যেন আমার সুন্নাতে ও সৎপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদ্বীনের সুন্নাতে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে। তোমরা এসব সুন্নাতকে চোয়ালের দাঁতের সাহায্যে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর।”

- **সহীহঃ ইবনু মা-জাহ (৪২)**

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ । এ হাদীসটি সাওর ইবনু ইয়াযীদ-খালিদ ইবনু মা‘দান হতে, তিনি ‘আবদুর রাহমান ইবনু ‘আম্‌র আস-সুলামী হতে, তিনি আল-ইরবায ইবনু সারিয়াহ্ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন । আল-হাসান ইবনু ‘আলী আল-খাল্লাল আরো অনেকে আবূ আসিম হতে, তিনি সাওর ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি খালিদ ইবনু মা‘দান হতে, তিনি ‘আবদুর রাহমান ইবনু ‘আম্‌র আস-সুলামী হতে, তিনি আল-ইরবায ইবনু সারিয়াহ্ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের মতো হাদীস বর্ণনা করেছেন । আল-ইরবায (রাঃ)-এর উপনাম আবূ নাজীহ । এ হাদীস হুজ্‌র ইবনু হুজ্‌র-ইরবায (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণিত হয়েছে ।

- **জামে' আত-তিরমিজি: ২৬৭৬**
- **হাদিসের মান: সহিহ হাদিস**

**ব্যাখ্যা: এই হাদীস** *সাহাবীদের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনের* ***(আবু বকর,উমর,উসমান, আলী (রা.))*** *–এর অনুসরণের নির্দেশনা দেয়। তাঁদের জীবন ও নীতি মুসলমানদের জন্য আদর্শ।*

■ **প্রচ্ছদ-০৬ঃ সাহাবীদের অবস্থান অন্য সবার উর্ধ্বে:**

**নবী (সা.) বলেন,**

"আমার সাহাবীদের কেউ যেন আমার পর সমালোচিত না হয়। আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তাঁদের মাধ্যমে রক্ষা করেছেন এবং তাঁদের ঈমানের শক্তি তোমাদের সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" **(সহীহ বুখারী, হাদিস:৩৬৭৫)**

**এই** হাদীসে নবীজী (সা.) নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, সাহাবীদের ঈমান কোনো সাধারণ মুসলমানের তুলনায় অনেক উচ্চতর।

■ **সাহাবীদের আদর্শ আচরণের দৃষ্টান্ত:**

নবীজীর সাহাবীদের জীবনে ছিলো আনুগত্য, ত্যাগ ও বিশ্বাসের অনন্য উদাহরণ। উদাহরণস্বরূপ:--

- বদর,উহুদ,খন্দক,তাবুক —প্রতিটি যুদ্ধে সাহাবীরা নিজেদের জীবন বাজি রেখেছেন।
- হযরত আবু বকর (রা.) সমস্ত সম্পদ রাসূলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।
- হযরত উমার (রা.) বলেছিলেন,"আজ আমি অর্ধেক সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম।
- হযরত উসমান (রা.) তাবুক যুদ্ধের সময় হাজার উট দান করেছিলেন।
- হযরত আলী (রা.) নবীজীর বিছানায় শুয়ে নিজের জীবনকে বিপন্নের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন।

এই দৃষ্টান্তগুলো হাদীসসমূহের বাস্তব ব্যাখ্যা –যেখানে সাহাবীদের ঈমান বাস্তব জীবনে প্রকাশ পেয়েছিলো।

■ **প্রচ্ছদ-০৭ঃ উলামাদের দৃষ্টিতে সাহাবীদের মর্যাদাঃ**

■ **ইমাম তাহাবি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ " *আক্বীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ" তে* বলেন,**

***وَ نُحِبُّ أَصْحابُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ وَ لَا نَفَرْطُ فِى حَبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَ لَا نتبرا مِنْ أَحَد مِنْهُمْ.***

***অর্থঃ** "আমরা রাসূল (সা.) এর সাহাবীদের ভালোবাসি। আমরা কারও প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা দেখাই না, আবার কারও থেকে বিমুখও হই না।"*

■ **ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন,**
" যে ব্যক্তি সাহাবীদের সম্পর্কে নিন্দা করে, সে কুরআন ও সুন্নাহ উভয়ের বিপরীতে অবস্থান করে।" **(মাজমু' আল-ফাতওয়া খন্ড-০৩)**

■ **ইমাম আহমাদ ( রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিতঃ**
**তিনি বলেন,**

**مَنْ كانَ مُتَأَسِّ بِأَصْحابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ فَإِنَّهُمْ اَبَرُّهَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوْبًا وَ أَعْمَقُهَا عِلْمًا وَ أَقَلُّهَا تَكَلُّفًا وَ أَقْوَمُهَا هَدْيًا وَ أَحْسَنُهَا حالًا. قَوْمٌ إِخْتَا رَهُمُ اللهُ بِصُحْبَةِ نَبِيِّةِ وَ إِقَامَةِ دِيْنِهِ. فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْا اَثَارَهُمْ فَإِنَّهُمْ كانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ.**

**অর্থঃ** কেউ যদি কারোর আদর্শের অনুসরণ করতে চায়,তবে তার উচিত প্রিয় নবীর সাহাবীদের অনুসরণ করা। কারন গোটা উম্মতের মাঝে তাঁরাই অন্তরের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি পবিত্র, জ্ঞান ও ইলমের বিষয়ে গভীরতম। লৌকিকতার বিচারে স্বল্পতম,আদর্শ, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের দিক লক্ষ করলে তাঁরা দৃঢ়তম, অবস্থার দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। তাঁরা ছিলেন এমন এক কওম যাঁরা আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে প্রিয় নবীর সাহচর্যের জন্য এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত। অতএব, তোমরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা জেনে রাখো এবং তাঁদের অনুসরণ করে চলো। কারন তাঁরাই সরল,সোজা ও সঠিক পথে পরিচালিত।

## ■ অধ্যায়-০৬ঃ বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবীদের নামঃ

■ **মানব জাতির মধ্যে নবী ও রাসূলগণ সবচেয়ে বেশি সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য।** তাঁদের পর তাঁদের সাহাবাগণই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাই সাহাবা শব্দের পর **"কেরাম (كِرام)"** শব্দ ব্যবহার করা হয়। **কেরাম মানে সম্মানিত।** সাহাবায়ে কেরাম মানে সম্মানিত সাহাবাগণ। শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) রাসূলগণের মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি তাঁর সাহাবাগণও অন্যান্য সব নবীর সাহাবাগণ থেকে বেশি মর্যাদার অধিকারী।

■ **কোনো সাহাবীর নাম** নিলে নামের শেষে (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) বলতে হয়। এ কথার অর্থ হলো, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।

**আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে এই কথা ঘোষণা করেছেন যে,**

**"আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট।"**

■ **ইতিহাসবিদদের মতে রাসূলের সাহাবীদের সংখ্যা ১ লক্ষেরও বেশী।**

এখন, আমরা বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবিদের নাম, পরিচয় এবং তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে জানবো।

### ■ ০১) আবু বকর সিদ্দীক (রা.)

- **রাসূল (সা.) বলেছেন: আমি প্রতিটি মানুষের ইহসান পরিশোধ করেছি কিন্তু আবু বকরের ইহসান সমূহ এমন যে,তা পরিশোধ করতে আমি অপরাগ। তার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহই দিবেন।তাঁর অর্থ সম্পদ আমার উপকারে যেমন এসেছে, অন্য কারো অর্থ তেমন উপকারে আসেনি।**

**আবু বকরা (রা.) ও উমার (রা.)** ঐ সমস্ত জান্নাতীদের সরদার হবেন যারা বৃদ্ধ বয়সে ইন্তেকাল করেছেন।

**عَنْ عَلِيِّ بْنِ طالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ اِذْ طَلَعَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ هٰذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْأٰخِرِيْنَ إِلَّا النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ ،يَا عَلِيُّ لَا تُخْبِرْهُمَا.**

**আলী ইবনে আবু তালেব** (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একদা রাসূল (সা.) এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ করে আবু বকর ও উমর (রা.) চলে আসল। রাসূল (সা.) বল্লেন:

**“তাঁরা উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুবরণকারী মুসলমানদের সর্দার হবে,চাই তাঁরা পূর্ববর্তী উম্মতের লোক হোক আর পরবর্তী উম্মতের।তবে নবী-রাসূলগণ ব্যতীত।**
**হে আলী! তুমি এ সংবাদ তাদেরকে দিয়ে দিও না।”**
**(তিরমিজি, আবওয়াবুল মানাকের আবু বকর সিদ্দীক-৩/২৮৯৭)**

**এখন আমরা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে জেনে নেই।**

**■ নাম ও পরিচিতিঃ**

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.)-এর প্রকৃত নাম আব্দুল্লাহ, উপাধি সিদ্দীক ও আতিক এবং নাম বা কুনিয়াত আবু বকর।পিতার নাম উসমান, কুনিয়াত আবু কুহাফা এবং মাতার নাম উন্মুল খায়র সালমা বিনতে সখর।কুরাইশ বংশের উর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ “মুররাতে গিয়ে নবী করীম (সা.) এর নসবের সাথে তাঁর নসব একত্রিত হয়েছে। তিনি রাসূল (সা.) এর চাচাতো ভাই ছিলেন।

**জন্ম তারিখঃ**

আবু বকর হিজরতের ৫০ বছর ৬ মাস পূর্বে **“আমুল ফীল”** এর ২ বছর ৪ মাস পরে ৫৭-৫৭২ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের বনি তাইম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

**ইসলাম গ্রহণঃ**

আবু বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকেই রাসূল (সা.) এর সাথে তার সখ্যতা ছিলো। ইসলাম গ্রহণকারী নারী-পুরুষদের মাঝে তিনি দ্বিতীয় এবং বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম।

**চারিত্রিক গুণাবলীঃ**

আবু বকর (রা.) ছিলেন সম্মানিত কুরাইশ বংশের ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। জ্ঞান,মেধা,অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সচ্চরিত্রতার জন্য আপামর মক্কা বাসীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

**বয়স্কদের মধ্যে প্রথম মুসলমানঃ**

নবী কারীম (সা.) এর নবুওয়াত লাভের ঘোষণায় মক্কায় হৈ চৈ পড়ে যায়। মক্কার প্রভাবশালী ধনী নেতৃবৃন্দ তাঁর বিরোধিতা করতে লাগল। কেউবা তাকে পাগল, কেউবা জ্বীনে ধরা বলতে থাকে। নেতৃবৃন্দের ইশারায় ও তাদের দেখাদেখি সাধারণ মানুষও ইসলাম গ্রহণ থেকে দূরে সরে ছিলো। এ বিষয়ে রাসূল (সা.) বলেন,

"আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেছি, একমাত্র আবু বকর ছাড়া প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু দ্বিধা-দ্বন্দের ভাব লক্ষ্য করেছি।"

**এভাবে আবু বকর (রা.) হলেন বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম মুসলমান।**

**দাওয়াতি কাজে মনোনিবেশঃ**

ইসলাম গ্রহণের পর দ্বীনের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য তিনি রাসূল (সা.) এর সাথে দাওয়াতি কাজে নিজেকে মনোনিবেশ করেন। মক্কার আশেপাশের সম্প্রদায়সমূহে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে লাগলেন। হজ্বের সময়ে বিভিন্ন তাবুতে গিয়ে মানুষদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব ও চেষ্টায় তৎকালীন কুরাইশ বংশের বিশিষ্ট যুবক **উসমান,যুবাইর,আব্দুর রহমান,সা'দ ও তালহার মতো ব্যক্তিবর্গসহ** আরো অনেকে ইসলামগ্রহণ করেছিলেন।

**দানশীলতাঃ**

রাসূল (সা.) এর নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়ার পর আবু বকর (রা.) তাঁর সঞ্চিত ৪০ হাজার দিরহাম ইসলামের জন্য ওয়াকফ করে দেন। বেলাল,খাব্বাব,আম্মার,আম্মারের মা সুমাইয়া, সুহাইব, আবু ফুকাইহ প্রমুখ দাস-দাসী তাঁরই ওয়াকফকৃত অর্থের বিনিময়ে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পান। এই জন্যই রাসূল (সা.) বলেছেন,

" আমি প্রতিটি মানুষের ইহসান পরিশোধ করেছি কিন্তু আবু বকরের ইহসান সমূহ এমন যে,তা পরিশোধ করতে আমি অপরাগ। তার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহই দিবেন।তাঁর অর্থ সম্পদ আমার উপকারে যেমন এসেছে, অন্য কারো অর্থ তেমন উপকারে আসেনি।"

তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূল (সা.) যখন সকলকে দান করার জন্য আহ্বান করেন, তখন আবু বকর (রা.) তাঁর সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। তখন রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করেন,

তোমার পরিবারের জন্য কিছু রেখে এসেছো কি? তনি উত্তর দিয়েছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।

**সিদ্দীক উপাধি লাভঃ**

রাসূল (সা.)--এর মুখে মিরাজের ঘটনা শুনে সবাই যখন দ্বিধাদ্বন্দে ছিলেন, তখন তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। কিছু সংখ্যক মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে। কুরাইশদের কিছু লোক তখন আবু বকরের কাছে গিয়ে বলে, "তোমার বন্ধু বলছে সে নাকি এক রাতে বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়েছিলো আবার ভোর হওয়ার আগেই সেখান থেকে ফিরে এসেছে। তুমি কি তার এই কথা বিশ্বাস করবে,সত্য বলে মেনে নিবে?"

তিনি বল্লেন, "রাসূল কি সত্যি এই কথা বলেছেন"? তারা বল্লেন "হ্যা"।

তখন আবু বকর বল্লেন,রাসূল যদি এ কথা বলে থাকেন তবে সত্যিই বলেছেন, আমি তা বিশ্বাস করি। তিনি এর চেয়ে বেশি যে আসমানী বার্তা ওহীর কথা বলেন আমিতো সেটাই বিশ্বাস করি,তাহলে এ আর এমন কী?" সেদিন থেকেই আবু বকরের উপাধি হয়ে যায় **"সিদ্দীক"(অতীব সত্যতার অধিকারী)।**

**এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে সূরা যুমারের ৩৩ নং আয়াতে বলেন,**

**وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدۡقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ**

**অর্থঃ** আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই হল মুত্তাকী। 'যে সত্য নিয়ে এসেছে'–এ থেকে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। যিনি সত্য দ্বীন নিয়ে আগমন করেছেন। কারো কারো নিকট এ কথাটি সাধারণ এবং এর লক্ষ্য এমন সকল ব্যক্তি, যারা তাওহীদের দাওয়াত দেয় এবং আল্লাহর শরীয়তের প্রতি মানুষকে পথপ্রদর্শন করে।

'যে তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে'– কেউ কেউ এ থেকে আবূ বকর (রাঃ)-কে বুঝিয়েছেন। যিনি সর্ব প্রথম রসূল (সাঃ)-এর সত্যায়ন করেছেন এবং তাঁর উপর ঈমান এনেছেন। আবার

কেউ কেউ এটাকে সাধারণ গণ্য করেছেন। যা সেই সমস্ত মু'মিনকে শামিল করে, যারা রসূল (সাঃ)-এর রিসালতের প্রতি ঈমান রাখে এবং তাঁকে সত্য নবী বলে মনে করে।

**রাসূলের সাহচর্য এবং হিজরতঃ**

মুসলমানদের উপর মুশরিকদের অত্যাচার যখন চরম আকার ধারণ করলো তখন তিনি হাবশায় হিজরত করার ইচ্ছে করেছিলেন কিন্তু "ইবনুদ দাগনাহ" নামক এক গোত্রপতি তাঁকে এ সিদ্ধান্ত থেকে নিরাপত্তার শর্তে বিরত রাখে। শর্তটি ছিলো প্রকাশ্যে সালাত আদায় করতে পারবে না।কিন্তু দীর্ঘদিন এই শর্ত পালন করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই তিনি উক্ত নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেয়।যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে রাসূলের সাথে হিজরত করার সৌভাগ্য দান করেন। হিজরতের সময় আবু বকর (রা.), রাসূল (সা.) কে সর্বদা নিরাপদ রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি সাওর পর্বতের গুহায় প্রবেশ করার সময় তিনি প্রথমে প্রবেশ করেছিলো। ভিতরে বিষাক্ত কিছু রয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য।

হিজরত থেকে শুরু করে রাসূলের জীবদ্দশায় যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো তিনি সবগুলোতে অংশগ্রহনের চেষ্টা করেছেন। মক্কায় উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা (রা.) মৃত্যুর পর রাসূল (সা.) কে যখন বিষন্ন দেখলেন, অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আদবের সাথে নিজের কন্যা আয়েশাকে রাসূল (সা.) এর বিবাহ দেন এমনকি বিবাহের মোহরের অর্থও তিনি পরিশোধ করেন।

**হজ্জের আমির নিযুক্তঃ**

মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে প্রথম ইসলামি হজ্জ উপলক্ষে নবী করীম (সা.) আবু বকর (রা.) কে **"আমীরুল হজ্জ"** হিসেবে নিযুক্ত করেন।নবী করীম (সা.)–এর ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্তে রোগ শয্যায় তাঁরই নির্দেশে মসজিদে নববীর সালাতের ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। মূলকথা, রাসূলে করীম (সা.) এর জীবদ্দশায় আবু বকর (রা.) তাঁর উযীর ও উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেছেন।

**খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণঃ**

রাসূল করীম (সা.)--এর ইন্তিকালের পর আবু বকর (রা.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। **"খলিফাতু রাসূলিল্লাহ"** –এ উপাধিটি অধিকার লাভ করেন। পরবর্তী খলিফাদের **"আমীরুল মু'মিনীন"-** উপাধি দেওয়া হয়েছে।

- **রাসূল (সা.) এর মৃত্যুর পর** যখন সব সাহাবীরা হতভম্ব হয়ে যান এমনকি উমর (রা.) কোষমুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে ঘোষণা করে বসেন-

**“যে বলবে রাসূল (সা.)--এর ইন্তিকাল হয়েছে তাঁকে হত্যা করবো।”**

এমন কঠিন মুহূর্তেও আবু বকর (রা.) ছিলেন অতীব দৃঢ় ও অবিচল চিত্তের অধিকারী। উপস্তিত জনতাকে উদ্দেশ্যে করে তিনি ঘোষণা দেন:

“যারা মুহাম্মদের ইবাদাত করবে তারা জেনে রাখ, মুহাম্মদ ইন্তিকাল করেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহর ইবাদাত কর তারা জেনে রাখ আল্লাহ চিরঞ্জীব – তাঁর কোনো মৃত্যু।”

তারপর আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন–

**وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُر ّٱللَّهَ شَيْـًٔاۗ وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ**

**অর্থঃ** মুহাম্মাদ রসূল ব্যতীত কিছু নয়,তার পূর্বে বহু রসূল গত হয়ে গেছে। সুতরাং সে যদি মারা যায় অথবা নিহত হয়, তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ যে পশ্চাদপসরণ করবে, সে কখনও আল্লাহর কিছু ক্ষতি করতে পারবে না।আর অচিরেই আল্লাহ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে পুরস্কৃত করবেন।

**(সূরা আলে-ইমরানঃ১৪৪ নং আয়াত)**

আবু বকর (রা.)-- এর মুখে এ আয়াত শুনে সাথে সাথে জনগণ চেতনা ফিরে পায়। এভাবে রাসূল কারীম (সা.) এর ইন্তেকালের সাথে সাথে প্রথম যে প্রকট সমস্যাটি দেখা দেয়, আবু বকর (রা.)-- এর হস্তক্ষেপে তার সমাপ্তি ঘটে।

**কুরআন সংকলক ও সংরক্ষকঃ**

আবু বকর (রা.)--এর আরেকটি বড় অবদান পবিত্র কুরআন কারীমের সংকলন ও সংরক্ষণ। তাঁর খিলাফাত কালের প্রথম দিকে আরবের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেসব বিদ্রোহ নির্মূল করতে গিয়ে বেশ কিছু হাফেজে কুরআন শহীদ হন। কেবলমাত্র “**মুসায়লামা কাজ্জাবের**” সাথে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতেই সাতশ হাফেজে কুরআন শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর উমর (রা.) এর পরামর্শে আবু বকর (রা.) সম্পূর্ণ কুরআন একত্রে করে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন এবং কপিটি নিজের কাছে হেফাজত করেন। **ইতিহাসে কুরআনের এ পুরানো কপিটি “মাসহাফে সিদ্দীকী” নামে খ্যাত।** পরবর্তী কালে উসমান (রা.) এর যুগে কুরআনের যে কপিগুলো করা হয় তা মূলত: ‘মাসহাফে সিদ্দীকীর’ অনুলিপি মাত্র।

কুরআন ও রাসূলের বাণীতে আবু বকর (রা.)-এর সীমাহীন মর্যাদা ও সম্মানের কথা বহুবার বহু স্থানে ঘোষিত হয়েছে।

**উমর (রা.) বলেন,**

“হে রাসূলের প্রতিনিধি! আপনি আপনার পরবর্তীদের কঠিন পরীক্ষায় নিমজ্জিত করে গেলেন। আপনার পথের উপর দিয়ে চলাতো দূরের কথা,পদানুসরণ করাও কঠিন ব্যাপার। আমি আপনার সাথে কিভাবে বৈঠকে মিলিত হবো?”

## ● আবু বকর (রা:) সম্পর্কে হাদীসসমূহঃ

**■ আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত: রাসূল (সা.) বলেছেন,**

“যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করবে তাঁকে জান্নাতের দারোয়ান প্রতিটি দরজা দিয়ে ডাক দিবে,এদিকে আসুন। এ কথা শুনে আবু বকর (রা.) বল্লেন,সেই ব্যক্তির জন্য কোনো চিন্তা নেই। রাসূল (সা.) বল্লেন, আমি আশা করি তুমি হবে তাঁদের একজন।রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে হতে কি সিয়াম পালন করেছ? আবু বকর (রা.) বল্লেন, আমি। পুনরায় রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন,আজকে জানাযায় কে অংশগ্রহণ করেছ? আবু বকর (রা.) বল্লেন,আমি। পুনরায় রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, ভিক্ষুককে আজ কে খেতে দিয়েছ? আবু বকর (রা.) বল্লেন, আমি। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো,রোগী দেখতে গিয়েছিল কে? এবারও আবু বকর (রা.) বল্লেন, আমি।

রাসূল (সা.) আবু বকর (রা)- এর প্রতিটি গুনের সমাবেশ শুনে বল্লেন,যার মধ্যে উপরিউক্ত ০৪ টি গুণ বিদ্যমান সে নিঃসন্দেহে জান্নাতে যাবে।

**■ আবূ সা’ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ**

**حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ أَبُوْ النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ  الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ قَالَ فَبَكَى أَبُوْ بَكْرٍ فَعَجِبْنَا لِبُكَائِهِ أَنْ يُخْبِرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَبْدٍ خُيِّرَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْمُخَيَّرُ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ أَعْلَمَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِيْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا غَيْرَ رَبِّيْ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِيْ بَكْرٍ**

**অর্থঃ** তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা সাহাবীদের উদ্দেশ্যে খুৎবার কালে বললেন,

"আল্লাহ্ তাঁর এক প্রিয় বান্দাকে পার্থিব ভোগ বিলাস এবং তাঁর নিকট রক্ষিত নি'মাতসমূহ এ দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দান করেছেন এবং ঐ বান্দা আল্লাহ্র নিকট রক্ষিত নিয়ামতসমূহ বেছে নিয়েছে। রাবী বলেন তখন আবূ বকর (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক বান্দার খবর দিচ্ছেন যাকে এভাবে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে (তাতে কান্নার কী কারণ থাকতে পারে?) কিন্তু পরে আমরা বুঝতে পারলাম, ঐ বান্দা স্বয়ং আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন এবং আবূ বকর (রাঃ) আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,
"যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ দিয়ে, তার সঙ্গ দিয়ে আমার উপর সর্বাধিক ইহসান করেছে সে ব্যক্তি হল আবূ বকর (রাঃ)। আমি যদি আমার রব ছাড়া অন্য কাউকে আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আবূ বাক্রকে করতাম। তবে তার সঙ্গে আমার দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব, আন্তরিক ভালোবাসা আছে। মাসজিদের দিকে আবূ বাকরের দরজা ছাড়া অন্য কোন দরজা খোলা রাখা যাবে না।" **(আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৩৮২, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৩৩৮৯)**

**সহিহ বুখারী: ৩৬৫৪**
**হাদিসের মান: সহিহ হাদিস**

**■ যুবাইর ইবনে মুতয়িম হতে বর্ণিতঃ**
"রাসূল (সা.)-এর নিকট এক মহিলা এসে কথোপকথন করে চলে যাচ্ছিলেন। এমতবস্থায় মহিলা জিজ্ঞেস করলো,হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ইন্তিকাল করলে কার নিকট যাবো? রাসূল (সা.) বল্লেন,

**فَإِنْ لَمْ تَجِدِيْنِيْ فَأْتِى أَبَا بَكْرٍ، أَنْتَ صَاحِبِىْ فِى الْغَارِ وَ صَاحِبِىْ عَلٰى الْحَوْضِ.**

আমাকে না পেলে আবু বকরের নিকট আসবে। রাসূল (সা.) আবু বকরকে বলে, তুমি সওর নামক গুহাতে আমার বন্ধু ছিলে,হাউজে কাউসারেও তুমি আমার বন্ধু থাকবে।"

**■ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিতঃ**
আমার আব্বা আবু বকর রাসূলের দরবারে তাশরীফ আনেন। তখন রাসূল (সা.) বলেন,

**أَنْتَ عَتِيْقٌ مِنَ النَّارِ.**

**অর্থঃ তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। সেদিন হতে তাঁর নাম হয়ে যায় *"আতীক"।***

■ রাসূল (সা.) আরও বলেন,

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ أُمَّتِي.

**অর্থঃ** হে আবু বকর! আমার উন্মাতের মধ্য হতে তুমি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।

## ● আবু বকর (রা.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহঃ

■ **আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে বলেন,**

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

**অর্থঃ** যদি তোমরা তাকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর, তাহলে আল্লাহই (তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি) তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে, যখন অবিশ্বাসীরা তাকে (মক্কা হতে) বহিষ্কার করে দিয়েছিল, যখন সে ছিল দুজনের মধ্যে একজন; যখন উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল। সে তখন স্বীয় সঙ্গী (আবু বাকর)কে বলেছিল, 'তুমি বিষণ্ণ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।'[১] অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা অবতীর্ণ করলেন এবং এমন সেনাদল দ্বারা তাকে শক্তিশালী করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি[২] এবং তিনি অবিশ্বাসীদের বাক্য নীচু করে দিলেন, আর আল্লাহর বাণীই সমুচ্চ রইল।[৩] আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

**[১]** জিহাদ থেকে যারা পিছিয়ে থাকতে অথবা গা বাঁচাতে চায়, তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, যদি তোমরা সাহায্য না কর, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ তাআলা নিজ নবীর মদদ সেই সময়ও করেছিলেন যখন তিনি সওর গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর তাঁর সঙ্গী (আবু বকর (রাঃ))-কে বলেছিলেন, "চিন্তা করো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" এর বিস্তারিত বর্ণনা হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। হিজরতের ঘটনায় আবু বাকর (রাঃ) বলেন, যখন আমরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি নবী (সাঃ)-কে বলেছিলাম, 'ঐ মুশরিকরা (যারা আমাদের পিছন ধরেছে তারা) যদি নিজেদের পায়ের নিচে তাকায়, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে দেখে নেবে।' নবী (সাঃ) বললেন, "হে আবু বাকর! তোমার সেই দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে কি ধারণা, যাদের তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ?" অর্থাৎ, যাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য ও মদদ রয়েছে।

**(বুখারীঃ সূরা তাওবার ৪০নং আয়াত ব্যাখ্যা)**

**এখানে সেই দুই প্রকার সাহায্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর রসূল (সাঃ)-কে সাহায্য করেছিলেন।**

**প্রথমতঃ হল প্রশান্তি বা সান্ত্বনা এবং**
**দ্বিতীয়তঃ হল ফিরিশতাদের সহযোগিতা।**

■ অবিশ্বাসী কাফেরদের বাক্য বলতে শিরক, আর আল্লাহর বাণী বলতে তাওহীদ উদ্দেশ্য। যেমন, এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা রসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল "একজন বীরত্বের শক্তি প্রকাশ করার জন্য যুদ্ধ করে, একজন স্বগোত্রের অন্ধ পক্ষপাতিত্ব করে যুদ্ধ করে, আর অন্য একজন লোক দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে, এদের মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কার হয়? তিনি বললেন, "যে আল্লাহর কালেমা (বাণী)-কে সুউচ্চ করার জন্য যুদ্ধ করে, তার যুদ্ধ আল্লাহর রাস্তায় হয়।"

**(বুখারীঃ ইলম অধ্যায়, মুসলিমঃ ইমারা অধ্যায়)**

**■ আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের অন্য আয়াতে বলেন,**

**يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ**

**অর্থঃ হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।(আয়াত-০১)**

**يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ**

**অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না এবং তোমরা নিজেরা পরস্পর যেমন উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরকম উচ্চস্বরে কথা বলো না। এ আশঙ্কায় যে তোমাদের সকল আমল-নিষ্ফল হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না। (আয়াত-০২)**

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চ স্বরে কথা বল, তার সাথে সেইভাবে উচ্চ স্বরে কথা বলো না; কারণ এতে অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে।[১]

[১] এখানে সেই আদব, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মর্যাদা-সম্মানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যা প্রত্যেক মুসলিমকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য নিবেদন করতে হয়। প্রথম আদব হল, তাঁর উপস্থিতিতে যখন তোমরা আপোসে কথোপকথন কর, তখন তোমাদের কণ্ঠস্বর যেন তাঁর কণ্ঠস্বরের উপর উঁচু না হয়ে যায়। দ্বিতীয় আদব হল, যখন নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে কথোপকথন কর, তখন অতি বিনয়, ভদ্রতা ও ধীরতার সাথে কর। ঐভাবে উচ্চৈঃস্বরে তাঁর সাথে কথা বলো না, যেভাবে তোমরা আপোসে নিঃসংকোচে পরস্পরের সাথে বলে থাক। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল, 'হে মুহাম্মাদ! হে আহমাদ!' বলে ডেকো না, বরং শ্রদ্ধার সাথে 'হে আল্লাহর রসূল!' বলে সম্বোধন করো। যদি আদব ও শ্রদ্ধা-সম্মানের এই দাবীগুলোর খেয়াল না কর, তবে বেআদবী হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যার ফলে তোমাদের সৎকর্মাদি নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে, অথচ তোমরা তার কোন টেরও পাবে না। এই আয়াতের 'শানে নুযূল' (অবতরণের পটভূমিকা) জানার জন্য দেখুনঃ বুখারী, তাফসীর সূরা হুজুরাত। তবে নির্দেশের দিক দিয়ে আয়াতটি ব্যাপক।

■ **আল্লাহ তা'য়ালা অন্য আরেকটি আয়াতে বলেন,**

**وَلَا يَأۡتَلِ أُوْلُواْ ٱلۡفَضۡلِ مِنكُمۡ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤۡتُوٓاْ أُوْلِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ وَلۡيَعۡفُواْ وَلۡيَصۡفَحُوٓاْۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٌ**

**অর্থঃ** আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন কসম না করে যে, তারা নিকটাত্মীয়দের, মিসকীনদের ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। আর তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

**(সূরা নূরঃ ২২ নং আয়াত)**

■ মিসত্বাহ, যিনি আয়েশা (রাঃ) -র চরিত্রে অপবাদ রটনার ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, তিনি একজন গরীব মুহাজির ছিলেন। আত্মীয়তার দিক দিয়ে আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর খালাতো ভাই ছিলেন। এই জন্য তিনি তাঁর তত্তাবধায়ক ও ভরণপোষণের দায়িত্বশীল ছিলেন। যখন তিনিও (কন্যা) আয়েশা (রাঃ) -র বিরুদ্ধে চক্রান্তে শরীক হয়ে পড়েন, তখন আবু বাকর

সিদ্দীক (রাঃ) অত্যন্ত মর্মাহত ও দুঃখিত হন; আর তা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং পবিত্রতার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি কসম করে বসলেন যে, আগামীতে তিনি মিসত্বাহকে কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করবেন না। আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর এই শপথ যদিও মানব প্রকৃতির অনুকূলই ছিল, তবুও সিদ্দীকের মর্যাদা এর চাইতে উচ্চ চরিত্রের দাবীদার ছিল। সুতরাং তা আল্লাহর পছন্দ ছিল না। যার কারণে তিনি এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন, যাতে অত্যন্ত স্নেহ-বাৎসল্যের সাথে তাঁর শীঘ্রতাপ্রবণ মানবীয় আচরণের উপর সতর্ক করলেন যে, তোমাদের ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে। আর তোমরা চাও যে, মহান আল্লাহ তোমাদের সে ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমা করে দেন। তাহলে তোমরা অন্যের সাথে ক্ষমা-সুন্দর আচরণ কর না কেন? তোমরা কি চাও না যে, মহান আল্লাহ তোমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন? কুরআনের এই বর্ণনা-ভঙ্গি এতই প্রভাবশালী ছিল যে, তা শোনার সাথে সাথে সহসা আবু বাকর (রাঃ)-এর মুখ হতে বের হল, 'কেন নয়? হে আমাদের প্রভু! আমরা নিশ্চয় চাই যে, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর।' এরপর তিনি কসমের কাফফারা দিয়ে পূর্বের ন্যায় মিসত্বাহকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে শুরু করেন। **(ফাতহুল ইবনে কাসীর)**

■ **আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,**

**يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ**

**অর্থঃ** হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর তোমাদের নিজদের দায়িত্ব। যদি তোমরা সঠিক পথে থাক তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন; তখন তিনি তোমরা যা আমল করতে তা তোমাদের জানিয়ে দেবেন।

**(সূরা মায়িদাঃ ১০৫ নং আয়াত)**

**●সাহাবায়ে কিরাম এবং ইমামগণের উক্তিঃ**

■ **উমর (রা.) বলেন,**

**أَبُوْ بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَ خَيْرُنَا وَ أَحَبُّنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ**

**অর্থঃ** আবু বকর (রা.) ছিলেন আমাদের নেতা এবং আমাদের মধ্য হতে সবচেয়ে সেরা মানব। আবু বকর (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.) এর অতি প্রিয় মানুষ।

**■ আলী (রা.) বলেন,**

আমরা কেউই আবু বকরের সমান নেকী অর্জন করা তো দূরের কথা তাঁর  নিকটবর্তীও হতে পারি নি।

**■ বর্ণনাকারী ইবনে ইউনুস বলেন,**

"পূর্ববর্তী কিতাবে আবু বকরের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে বৃষ্টির সঙ্গে। যেখানেই বৃষ্টির কণা পড়ে সেখানেই উপকার হয়। আবু বকর (রা.)-এর মতো পূর্ববর্তী কোন নবীর সহচর ছিলো না।

**■ ইসলামী জাহানের দ্বিতীয় খলিফা উমার (রা.) বলেন,**

"সারা বিশ্বের মানুষের ঈমান যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় রাখা হয় আবু বকর (রা.)-এর ঈমান, তাহলে আবু বকর (রা.)-এর ঈমানের পাল্লাই ঝুলে যাবে অর্থাৎ ভারী হবে।তিনি আরও বলেন, আবু বকর (রা.) সর্বদিক দিয়ে আমাদের উর্ধ্বে ছিলেন। তিনি আমাদের মাঝে সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন।

**■ উমার (রা.) আরও বলেন,**

"আবু বকর (রা.) কে যে অবস্থায় জান্নাতে দেখেছি আমারও এরূপ আকাঙ্ক্ষা হয়।আবু বকরের শরীরের দুর্গন্ধ মিশকের আম্বরের চেয়ে অধিক সুগন্ধযুক্ত।

**■ আবু হুসাইন (রা.) বলেন,**

" আদম সন্তানের মধ্যে নবীদের পরেই আবু বকরের স্থান। তিনি স্ব-ধর্ম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে একজন নবীর মতো কঠোরতা করেছিলেন।

**■ মুহাম্মদ ইবনে যুবাইর (রা.) বলেন,**

" আমি হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কিছু সংখ্যক লোকের মাঝে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। আপনি সঠিক তথ্য পরিবেশন করে সন্দেহমুক্ত করেন। আচ্ছা!  আবু বকরকে খলিফা নির্বাচন কি রাসূল (সা.) করেছিলেন?  তিনি এ কথায় গর্জে উঠে বলেন,তোমার কি তাতে সন্দেহ আছে,আল্লাহর শপথ, আল্লাহই তাঁকে খলিফা নির্বাচন করেছিলেন। আল্লাহ

তাঁকে করবেন না কেনো,তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিজ্ঞ,স্বচ্ছ জ্ঞানের অধিকারী এবং আল্লাহভীরু। তাঁকে খলিফা নির্বাচন করাতো যথার্থই হয়েছে। তিনি যদি ইসলাম জাহানের খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ না করতেন তাহলে ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়ানোর আগেই বিদায় নিতো এবং এক প্রভুর উপাসক একজনও থাকতো না।”

■ **ইমাম শাবী (রহ.) বলেন,**

“ আবু বকর (রা.) এর মধ্যে এমন চারটি গুনের সমাবেশ আছে যা অন্য কারও মধ্যে পাওয়া যায় নি,যথাঃ

**০১)** একমাত্র তাঁরই নাম সিদ্দীক,

**০২)** সওর নামক গুহায় রাসূলের সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য তাঁরই জুটেছিল,

**০৩)** নবী কারীম (সা.) একমাত্র তাঁকেই ইমাম করেছিলেন,

**০৪)** রাসূলের সঙ্গে তিনি মদিনায় হিজরত করেছিলেন।”

**রাকিম আবু বকর (রা.)** এর আরও একটি গুন বাড়িয়ে দেন সেটা হলো,

**“রাসূল (সা.) তাঁর জীবনের শেষ সালাত আবু বকর (রা.)- এর মুক্তাদী হয়ে পড়েন।”**

■ **ইমাম আবু জাফর (র.) বলেন,**

“ আবু বকর (রা.), রাসূল (সা.) এবং জীবরাঈল (আ.)_ এর মধ্যকার কথোপকথন শুনতে পেতেন,কিন্তু তা দেখতে পেতেন না।”

**মৃত্যু ও সমাধিঃ**

**১৩** হিজরীর ৭ জমাদিউল উখরা আবু বকর (রা.) জ্বরে আক্রান্ত হয়ে **১৫** দিন অসুস্থ থাকার পর হিজরী **১৩** সনের **২১** জমাদিউল উখরা, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন। আয়েশা (রা.)_এর হুজরায় নবী করীম (সা.) এর রওজার একটু পূর্ব-পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়। আর এভাবেই সমাপ্তি হয় হয় নবী-রাসুলের পরে একজন মহামানবের।

## ■ ০২) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.):

- তোমরা আমাকে মুহাম্মাদ (সা.) এর নিকট নিয়ে চলো। উমরের এই কথা শুনে এতক্ষণে খাব্বাব ঘরের গোপন স্থান থেকে বের হয়ে এলেন। বল্লেন:

সুসংবাদ উমর! বৃহস্পতিবার রাতে নবী করীম (সা.) তোমার জন্য দোয়া করেছিলেন। আমি আশা করি তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ!উমার ইবনুল খাত্তাব অথবা আমর ইবন হিশামের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করো।"

**আবু বকরা (রা.) ও উমার (রা.)** ঐ সমস্ত জান্নাতীদের সরদার হবেন যারা বৃদ্ধ বয়সে ইন্তেকাল করেছেন।

**عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ إِذْ طَلَعَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ هٰذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْأٰخِرِيْنَ إِلَّا النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ ،يَا عَلِيُّ لَا تُخْبِرْهُمَا.**

**আলী ইবনে আবু তালেব** (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একদা রাসূল (সা.) এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ করে আবু বকর ও উমর (রা.) চলে আসল। রাসূল (সা.) বল্লেন:

**"তাঁরা উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুবরণকারী মুসলমানদের সর্দার হবে,চাই তাঁরা পূর্ববর্তী উম্মতের লোক হোক আর পরবর্তী উম্মতের।তবে নবী-রাসূলগণ ব্যতীত।**
**হে আলী! তুমি এ সংবাদ তাদেরকে দিয়ে দিও না।"**
**(তিরমিজি, আবওয়াবুল মানাকের আবু বকর সিদ্দীক-৩/২৮৯৭)**

**এখন আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব সম্পর্কে জেনে নেই:-**

**নাম ও পরিচিতিঃ**

তাঁর নাম উমার,উপাধি ফারুক এবং কুনিয়াত আবু হাফস। পিতার নাম খাত্তাব এবং মাতার নাম হানতামা। কুরাইশ বংশের আ'দী গোত্রের লোক।উর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষ " কাব" নামক ব্যক্তির মাধ্যমে রাসূলের নসবের সাথে তাঁর নসব একত্রিত হয়েছে।মক্কার জাবালে "আকিব" এর পাদদেশে ছিলো অন্ধকার যুগে বনী আ'দী ইবন কাবের বসতি। আর এখানেই ছিলো উমারের বাসস্থান। ইসলামী যুগে উমারের নামানুসারে পাহাড়টির নাম হয় "জাবালে উমার" বা "উমারের পাহাড়"।

**জন্মঃ**

রাসূলে করীম (সা.) এর জন্মের ১৩ বছর পর তাঁর জন্ম।মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল রাসূল (সা.) এর বয়সের সমান ৬৩ বছর। তবে তাঁর জন্ম ও ইসলাম গ্রহণের সময় প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

**ইসলাম গ্রহণঃ**

উমারের ইসলাম গ্রহণ এক চিত্তাকর্ষক ঘটনা। উমারের ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের পর তার বোনও ইসলাম গ্রহণ করে। এই খবর শুনে তিনি দ্রুত তাদের বাড়িতে যায় এবং তাদের উপর চড়াও হন। সেই সময়ে তারা সূরা ত্বহা তিলাওয়াত করছিলেন। যা পরবর্তীতে উমারের ইসলাম গ্রহণের প্রতি সহায়ক হয়। তিনি নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন।

**ইমাম যুহরী বর্ণনা করেনঃ** রাসূল করীম (সা.) এর দারুল আরকামে প্রবেশের পর উমার ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পূর্বে নারী-পুরুষ সর্বমোট ৪০ জন অথবা চল্লিশের কিছু বেশি লোক ইসলাম কবুল করেছিলেন। উমারের ইসলাম গ্রহণের পর জীবরাঈল (আ.) এসে বলেন,

“মুহাম্মদ,উমারের ইসলাম গ্রহণে আসমানের অধিবাসীরা আনন্দিত হয়েছে।”

**প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারঃ**

উমার (রা.)-- এর ইসলাম গ্রহণে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়।যদিও তখন ৪০/৫০ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং তাদের মধ্যে হামযা (রা.) ছিলেন অন্যতম। তথাপি মুসলমানদের পক্ষে কা'বায় প্রবেশ করে সালাত আদায় তো দূরের কথা নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করাও নিরাপদ ছিলো না। উমার (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে এ অবস্থার পটভূমি পরিবর্তন হয়।তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিলেন এবং অন্যান্যদেরকে সাথে নিয়ে কা'বা ঘরে সালাত আদায় শুরু করলেন।

**আল-ফারুক উপাধি লাভঃ**

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে “আল-ফারুক” উপাধি দেন।কেননা তাঁর কারনেই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে প্রকাশ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

উমারের জিহ্বা ও অন্তঃকরণে আল্লাহ তা'য়ালা সত্যকে দৃঢ় করে দিয়েছেন। তাই সে ফারুক। আল্লাহ তাঁর দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন।

**হিজরতঃ**

উমার (রা.)--এর হিজরত ও অন্যদের হিজরতের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। অন্যদের হিজরত ছিলো নীরবে নীরবে। সকলের অলক্ষ্যে-অগোচরে। আর উমার (রা.) এর হিজরত ছিলো জনসম্মুখে প্রকাশ্যে। তার মধ্যে ছিলো কুরাইশদের প্রতি চ্যালেন্জ ও বিদ্রোহের ধ্বনি।

**আমীরুল মু'মিনীন উপাধিঃ**

উমার (রা.) প্রথম খলিফা যিনি আমীরুল মু'মিনীন উপাধি লাভ করেন। তিনি সর্বপ্রথম হিজরী সন প্রবর্তন করেন,তারাবীর সালাত জামাআতে আদায়ের প্রচলন করেন,জনশাসনের।জন্য দুর্রা বা ছড়ি ব্যবহার করেন,মদপানে আশিটি বেত্তাঘাত নির্ধারণ করেন,বহু রাজ্য বিজয় লাভ করেন,নগর পত্তন করেন,সেনাবাহিনীর স্তরভেদ এবং বিভিন্ন ব্যাটালিয়ান নির্দিষ্ট করেন।জাতীয় রেজিস্ট্রার বা নাগরিক তালিকা তৈরি করেন,কাযী নিয়োগ করেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করেন।

**উমার (রা.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবীদের উক্তিঃ**

- **আলী (রা.) বলেন,( خَيْرُ أُمَّتِيْ بَعْدَ نَبِيِّ أَبُوْ بَكْرٍعُمَر )** রাসূল (সা.) এর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি আবু বকর (রা.) তারপর উমার (রা.)।

- **আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)** বলেন,

"উমার (রা.) এর ইসলাম গ্রহণ ইসলামের বিজয়। তাঁর হিজরত আল্লাহর সাহায্য এবং তাঁর খিলাফত আল্লাহর রহমাত।"

উমার (রা.) এর যাবতীয় গুণাবলী লক্ষ্য করে **রাসূলে করীম (সা.) বলেন,**

**لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ**

**অর্থঃ** আমার পরে যদি কেউ নবী হতো তবে উমারই হতো।কারন তাঁর মধ্যে ছিলো নবীদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য।

**মৃত্যুবরণঃ**

প্রখ্যাত সাহাবী মুগীরা ইবন শু'বার (রা.)--এর অগ্নি উপাসক দাস আবু লূলূ ফিরোজ ফজরের সালাত আদায়রত অবস্থায় এ মহান খলিফাকে ছুরিকাঘাত করে। আহত হওয়ার তৃতীয় দিনে হিজরী ২৩ সনের ২৭ জিলহজ্জ বুধবার তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের পূর্বে আলী, উসমান,আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, সা'দ,যুবাইর ও তালহা (রা.)-- এ ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীর উপর তাদের মধ্য থেকে কোন একজনকে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করে যান। সুহাইব (রা.) জানাযার ইমামতি করেন।

## ■ ০৩) উসমান ইবনে আফফান (রা.):

- তাঁর চাচা হাকাম ইবনে আবিল 'আস রশি দিয়ে বেধে নির্মম নির্যাতন করতো। সে বলতো, একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করে তুমি আমাদের বাপ-দাদার মুখে কালিমা অংকন করে দিয়েছো।বএ ধর্ম পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তেমাকে ছাড়া হবে হবে না। এতে উসমান (রা.) ঈমানের পথ থেকে একটুও বিচ্যুত হন নি। তিনি বলতেন: তোমাদের যা ইচ্ছে তাই করো,এ ধর্ম আমি কখনই ছাড়বো না।

**নাম ও পরিচিতিঃ**

পিতার নাম আফফান এবং মাতার নাম আওয়া বিনতে কুরাইয। কুরাইশ বংশের উমাইয়া বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উর্ধ্বতন পুরুষ " আবদে মান্নাফে গিয়ে নবী করীম (সা.) ুর নসবের সাথে তাঁর নসব একত্রিত হয়েছে। তাঁর নানী বায়দা বিনতে আবদিল মুত্তালিব নবী করীম (সা.) এর ফুফু ছিলেন।

**জন্ম তারিখঃ**

জন্ম হস্তীসনের ৬ বছর পরে ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে। এ হিসেবে রাসূল (সা.) থেকে ৬ বছরের ছোট। তবে তাঁর জন্মসন প্রসঙ্গে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। ফলে শাহাদাতের সময় তাঁর সঠিক বয়স কত ছিলো সে বিষয়েও মতপার্থক্য পাওয়া যায়। কোনো কোনো বর্ণনা মতে, তিনি "তায়েফে" জন্মগ্রহণ করেন।

**গণী উপাধি লাভঃ**

যৌবনে তিনি অন্যান্য অভিজাত কুরাইশদের মতো ব্যবসা শুরু করেন। সীনাহীন সততা ও অতীব বিশ্বস্ততার গুণে ব্যবসায় অসাধারণ সফলতা লাভ করেন। মক্কার সমাজে একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী হিসেবে "গণী" উপাধিতে ভূষিত হন।

**ইসলাম গ্রহণঃ**

উসমানকে "আস-সাবেকুনাল আওয়ালুন" (প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী)। ছয়জন শ্রেষ্ঠ সাহাবীর মধ্যে গণ্য করা হয় যাদের প্রতি রাসূলে মাকবুল (সা.) আমরণ সন্তুষ্ট ছিলেন। উসমান বলেন, " আমি ইসলাম গ্রহণকারী চারজনের মধ্যে চতুর্থ।"

(উসদুল গাবা) ইবনে ইসহাকের মতে আবু বকর (রা.); আলী (রা.) এবং যায়েদ বিন হারিসার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সেই সময়ে তাঁর বয়স ছিলো প্রায় ৩০ বছর।

**(যুন নুরাইন)--দুই জ্যোতির অধিকারীঃ**

উসমান (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সা.) তাঁর নিজ কন্যা 'রুকাইয়া' কে বিবাহ দেন। হিজরী দ্বিতীয় সনে মদিনায় 'রুক্যাইয়া (রা.)' মৃত্যু বরণ করলে রাসূল (সা.) তাঁর অপর কন্যা 'উম্মু কুলসুম' কে বিবাহ দেন। এ কারনেই উসমান (রা.) **যুন নুরাইন– দুই জ্যোতির অধিকারী** উপাধি লাভ করেন।

**দানশীলতাঃ**

তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূল (সা.) যখন সকল সাহাবীকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য। তখন আবু বকর (রা.) তাঁর সমুদয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন; উমার (রা.) তাঁর অর্ধের সম্পদ দান করেন। এবং উসমান (রা.) যুদ্ধের এক-তৃতীয়াংশ খরচ বহন করেন। সাথে সারে নয়শটি উট এবং পঞ্চাশটি ঘোড়া সরবরাহ করেন।

**তখন রাসূল (সা.) বলেন,**

"আজ থেকে উসমান যা কিছুই করবে, কোনো কিছুই তার জন্য অকল্যানকর হবে না।"

**ইসলামের জন্য অবদানঃ**

ইসলামের জন্য উসমান (রা.) এর অবদান অপরিসীম। ইসলামের সংকটপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহর পথে তিনি যেভাবে খরচ করেছেন, অন্য কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি দান করেন নি।তিনি বিশাল অর্থের মাধ্যমে ইয়াহুদী মালিকানাধীন "বীরে রুমা" কূপটি ক্রয় করে মদীনার মুসলমানদের

জন্য ওয়াকফ করে দেন। বিনিময়ে নবী করীম (সা.) তাঁকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেন। ভাগ্যের নির্মমুম পরিহাস! যিনি একদিন "বীরে রুমা" ক্রয় করে মদীনার মুসলমানদের জন্য পানির সমস্যা দূর করেছিলেন,তাঁর বাড়িতেই সেই কূপের পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। সে ঘেরাও অবস্থায় একদিন জানালা দিয়ে মাথা বের করে মদীনাবাসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন,রাসূলে করীম (সা.) এর নির্দেশে আমিই "বীরে রূমা" ক্রয় করে সর্বসাধারণের ওয়াকফ করেছি।আজ সে কূপের পানি থেকেই আমাকে বঞ্চিত করলে। আমি আজ পানির অভাবে ময়লা পানি দিয়ে ইফতার করেছি।"

**মর্যাদাঃ**

উসমান (রা.) এর মর্যাদা ও ফজিলত সম্পর্কে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সারকথাঃ

**তিনি নবী করীম (সা.) এর অত্যন্ত প্রিয় সাহাবী ছিলেন।**

রাসূলের নিকটতম ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর বিশেষ স্থান ছিলো। নবী করীম (সা.) তাঁকে বারবার জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

**নবী করীম (সা.) বলেছেন,**

**" প্রত্যেক নবীরই বন্ধু থাকে,জান্নাতে আমার বন্ধু হবে উসমান (রা.)।"**

**(তিরমিজি)**

**আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) বলেন,**

"নবী করিম (সা.) এর সময়ে মুসলমানরা আবু বকর (রা.); উমার (রা.); উসমান (রা.) সকলের থেকে অধিক মর্যাদাবান মনে করতেন। তা ব্যতীত অন্য কোনো সাহাবিদের বিশেষ কোনো মর্যাদা দেওয়া হতো না।

■ একদা একেক করে সাহাবীরা রাসূলে করীম (সা.)-- এর গৃহে আসছিলেন।সেই সময় রাসূল শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। প্রথমে যখন আবু বকর (রা.) আসলেন রাসূল আগের মতোই ছিলেন। এরপর উমার (রা.) আসলেও একই অবস্থায় থাকেন কিন্তু যখন উসমান (রা.) আসলেন তখন

**রাসূলে করীম (সা.) ভালোভাবে কাপড়-চোপড় পরিধান করে বল্লেন,**

**أَلَا أَسْتَحْيِ رَجُوْلًا تَسْتَحْيِ مِنْهُ الْمَلَاءِكَةُ**

**অর্থঃ** আমি কি এমন ব্যক্তিকে দেখে লজ্জা করবো না যাকে দেখে স্বয়ং ফেরেশতারা লজ্জা করেন।

**শাহাদাত বরণঃ**

কাফির-মুনাফিকরা প্রথমে উসমান (রা.) কে মসজিদে নামাজ পড়তে বাঁধা দেয়। অতঃপর তাঁর গৃহে প্রবেশ করে রোযা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতরত বয়োবৃদ্ধ খলিফাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ ঘটনা সংঘটিত হয় **হিজরি ৩৫ সনের ১৮ই জিলহজ্জ শুক্রবার, আসর সালাতের পর।**

**সমাহিতঃ**

জান্নাতুল বাকীর **'হাশশে কাওকাব'** নামক অংশে দাফন করা হয়। মাগরিব ও এশার সালাতের মাঝামাঝি সময়ে দাফনকার্য সম্পন্ন করা হয়। **যুবাইর ইবনে মুতঈম (রা.)** তাঁর জানাযার ইমামতি করেন।

## ■ ০৪) আলী ইবনে আবু তালিব (রা.):

- আলী (রা.) নিজেকে একজন সাধারণ মুসলমানদের সমতুল্য মনে করতেন এবং যেকোনো ভুলের কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতেন।একবার এক ইয়াহূদী তাঁর বর্ম চুরি করে। আলী (রা.) বাজারে বর্মটি বিক্রি করতে দেখে চিনে ফেলেন।তিনি ইচ্ছে করলে সেটা জোর করে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। আইন মোতাবেক ইয়াহূদীর বিরুদ্ধে কাজীর আদালতে মামলা দায়ের করেন। কাজীও ছিলেন একজন কঠোর ন্যায়বিচারক। তিনি আলী (রা.) এর দাবির সমর্থনে প্রমাণ চাইলেন।আলী (রা.) প্রমাণ দিতে অপরাগ হলেন। কাজী ইয়াহূদীর পক্ষে মামলার রায় দিলেন।

**নাম ও পরিচিতিঃ**
ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) তাঁর নাম আলী; উপাধী আসাদুল্লাহ, হায়দার ও মুরতাজা। উপনাম আবুল হাসান ও আবু তুরাব।পিতার নাম আবু তালিব আবদে মান্নাফ ও মাতার নাম ফাতিমা। উভয়েই কুরাইশ বংশের হাতিম গোত্রের সন্তান।
**আলী (রা.) রাসূল (সা.)--এর আপন চাচাতো ভাই।**

**জন্ম ও ইসলাম গ্রহণঃ**
রাসূলে করীম (সা.)_এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির ১০ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়।রাসূলে করীম (সা.) যখন নবুওয়াত প্রাপ্তি হোন,আলীর বয়স তখন নয় থেকে এগারো বছরের মধ্যে।
**ইসলাম গ্রহণঃ** একদিন ঘরের মধ্যে দেখলেন রাসূলে করীম (সা.) এবং উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা (রা.) সিজদায় অবনত। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি? উত্তর পেলেন এক আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করছি। তোমাকেও এর দাওয়াত দিচ্ছি। আলী তাঁর মুরব্বির দাওয়াত বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন মুসলমান হয়ে যান।
**কুফর,শিরক ও জাহিলিয়্যাতের কোনো অশ্লীলতা ও অপকর্ম তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। বালক বয়সে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।**

**হায়দার উপাধি লাভঃ**
ইসলামের জন্য আলী (রা.)_এর অবদান অবিস্মরণীয়। রাসূলে করীম (সা.)_এর যুগের সকল যুদ্ধে সর্বাধিক সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন।এ কারণে রাসূল (সা.) তাঁকে **“হায়দার”** উপাধিসহ **“যুল-ফিকার”** নামক তরবারী দান করেন।

**আলী (রা.) ও আয়েশা (রা.)_এর বাহিনী মুখোমুখিঃ**

উসমান (রা.)_এর শাহাদাতের পর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আলী (রা.)। প্রকৃত পক্ষে যারা এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন তারাই আবার নিরীহ, সরল-সোজা মানুষ গুলোকে উসমান (রা.) হত্যার কিসাস গ্রহণের জন্য খেপিয়ে তুলেছিলেন। অথচ তাদের আসল উদ্দেশ্য মুসলিমদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে ঐক্য শক্তিকে নষ্ট করে ইসলামকে বিনষ্ট করে দেওয়া। এই ধোঁকায় পরে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) সহ তালহা ও যুবাইর (রা.)_এর মতো বিশিষ্ট সাহাবীরাও কিসাস গ্রহণের জন্য মক্কা থেকে বসরার দিকে সেনাবাহিনী নিয়ে বেড়িয়ে পড়েন। সেখানে তাঁদের সমর্থকদের সংখ্যা ছিলো প্রচুর। আলী (রা.) ও তাঁর বাহিনীসহ সেখানে উপস্থিত হন। বসরার উপকণ্ঠে বিরোধী দুই বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়।আয়েশা (রা.), আলী (রা.)_ এর কাছে তাঁর দাবি উপস্থাপন করেন। আলী (রা.) ও তাঁর সমস্যাগুলো উপস্থাপন করেন।যেহেতু উভয় পক্ষেই ছিলো সততা ও নিষ্ঠাবান তাই নিষ্পত্তি হয়ে যায় খুব সহজেই। তালহা ও জুবাইর (রা.) ফিরে চললেন। আয়েশা (রা.) ফিরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু দাঙ্গা সৃষ্টি করতে চাওয়া মুনাফিকগুলো উভয়দলেই বিদ্যমান ছিলো। তারা উভয় দলের মধ্যে কুমন্ত্রণা দিয়ে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়। যুদ্ধে তালহা ও যুবাইরসহ (রা.) সহ উভয় পক্ষের প্রায় ১৩ হাজার মুসলমান শাহাদাত বরন করেন। **যুদ্ধ অবস্থায় আম্মাজান আয়েশা (রা.) উটের উপর সওয়ার ছিলেন বিধায় ইতিহাসে এটি উটের যুদ্ধ নামে পরিচিত। হিজরি ৩৬ সনের জমাদিউস-সানি মাসে সংঘটিত হয়।**

**উটের এই যুদ্ধ ছিলো মুসলিমদের প্রথম আত্মঘাতী সংঘর্ষ।**

**সিফফীনের যুদ্ধঃ**

হিজরি ৩৭ সনের সফর মাসে "সিফফীন" নামক স্থানে আলী ও মুয়াবিয়া (রা.)_ এর বাহিনীর সাথে তুমুল সংঘর্ষ হয়।এই সংঘর্ষ ছিলো উটের যুদ্ধ থেকে আরও ভয়াবহ উভয় পক্ষে মোট প্রায় ৯০ হাজার মুসলমান শহীদ হন।তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসীর, খুযাইমা ইবনে সাবিত ও আবু আম্মারা আল-মাযিনীও ছিলেন। উল্লেখ্য যে, আম্মার ইবনে ইয়াসীর সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বলেছিলেন:

**আফসোস একটি বিদ্রোহী দল আম্মারকে শহীদ করবে।**

সিফফীনের সর্বশেষ সংঘর্ষ যাকে **'লাইলাতুল হার'** বলা হয়,আলী (রা.) বিজয় লাভ করেন।

**খারেজী দলের উন্মেষঃ**

এ সময় খারেজী নামে নতুন একটি দলের উন্মেষ ঘটে। প্রথমে তারা ছিলো আলী (রা.)_এর সমর্থক। কিন্তু পরে তারা এ বিষয় প্রচার করতে থাকে যে, ধর্মের বিষয়ে কোনো মানুষকে

‘হাকাম’ বা সালিশ নিযুক্ত করা একটি কুফরি কাজ।আলী (রা.) আনূ মিসা আশ'আরী কে হাকাম মেনে নিয়ে কুরআন বিরোধী কাজ করেছেন। কাজেই আলী (রা.) তাঁর আনুগত্য দাবী করার বৈধতা হারিয়েছেন। তরা আলী থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা ছিলো চরমপন্থী। তাদের সাথে আলী (রা.)_এর একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে প্রচুর লোক হতাহত হয়। খারেজী **সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তি আব্দুর রহমান মুলজিম,, আল-বারাক ইবনে আব্দুল্লাহ ও আমর ইবনে বকর আত-তামীমী** তারা চরম বিশ্বাসঘাতকতামূলক ষড়যন্ত্র করে মুসলিমদের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য **আলী (রা.); মুয়াবিয়া (রা.) এবং ও আমর ইবনুল আস (রা.)_ কে হত্যা করবে।**

**শাহাদাত বরণঃ**

হিজরী ৪০ সনের **১৬** রমজান শুক্রবার ফজরের সালাতের সময় অভ্যাসমত **‘আস-সালাত’** বলে মানুষকে সালাতের জন্য আহ্বান করতে করতে মসজিদে দিকে যাচ্ছিলেন পাপিষ্ঠ ইবনে মুলজিম শাণিত তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে আহত করে। **৪০ হিজরীর ১৭ রমজান** শনিবারে এই মহান খলিফা আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

**সমাহিতঃ**

আলী (রা.)_এর জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর ছেলে হাসান ইবনে আলী (রা.)। কুফা জামে মসজিদের পাশে তাকে দাফন করা হয়। ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৩ বছর।

## ■ ০৫) তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.):

- যদি কেউ মৃত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াতে দেখে আনন্দ পেতে চায়,তাহলে সে যেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে দেখে।এ কারণে তাঁকে জীবিত শহীদ বলা হয়েছে। সিদ্দীক আবু বকর (রা.) উহুদ যুদ্ধের প্রসংগ উঠালেই বলতেন,

**"সে দিনটির সবটুকুই ছিলো তালহার।"** এ যুদ্ধে তালহার কাজে রাসূল (সা.) এত প্রীত হন যে,তিনি তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসের সুসংবাদ দান করেন।

**যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ**

উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূল (সা.) দুই জোড়া পোশাক পরিধান করার কারনে পাথরের উপর আরোহন করতে পারছিলেন না। তখন তিনি তালহা (রা.)_ কে তাঁর নিচে বসালেন এবং তার উপর আরোহন করে পাথরে চড়লেন। যুবাইর (রা.) বলেন এ সময় আমি নবী করীম (সা.)_কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ **"তালহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে।"**

**(তিরমিজি,আবওয়াকুল মানাকেব আবু মুহাম্মদ তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ)**

**নামকরণ ও পরিচিতিঃ**

তাঁর নাম আবু মুহাম্মদ তালহা। পিতা উবাইদুল্লাহ এবং মাতা সা'বা। কুরাইশ গোত্রের তাইম শাখার সন্তান।আবু বকর (রা.) ও ছিলেন এ তাইম শাখার লোক। তাঁর মা সা'বা ছিলেন প্রখ্যাত শহীদ সাহাবী 'আলা ইবনুল হাদরামীর বোন।

**ইসলাম গ্রহণঃ**

তালহা ইসলামের সূচনাতেই মাত্র ১৫ বছর বয়সে ইসলাম কবুল করেছিলেন। আবু বকর সিদ্দীক (রা.)_এর দাওয়াতেই তিনি ইসলাম কবুল করেন। আইয়্যামে জাহেলিয়া যুগে আবু বকরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত বৈঠকের নিয়মিত সদস্য ছিলেন তিনি।

**ইসলাম গ্রহণঃ**

বদর, উহুদ,খন্দক সহ বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সামান্য ভুলের কারনে যখন একে একে সব সাহাবীরা শাহাদাত বরন করছিলেন আমাদের রাসূল (সা.)_ এর একটি দন্ত মোবারক ও শহীদ হয়েছিলো। তখন রাসূল (সা.)_এর

সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ান তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.)। শত্রুদের একটি পর তীরের আঘাতে তাঁর একটি হাত দেহ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং গোটা দেহে তরবারী ও তীর-বর্শার ৭০ টিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। এই জন্যই **রাসূল (সা.) বলেছেন,**

"যদি কেউ মৃত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াতে দেখে আনন্দ পেতে চায়,তাহলে সে যেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে দেখে।এ কারণে তাঁকে জীবিত শহীদ বলা হয়েছে।"

**উষ্ট্রের যুদ্ধ ও শাহাদাত বরণঃ**

চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকারী ইবনে সাবার লোকেরা যারাই ছিলো মূলত উসমান (রা.)_ এর হত্যাকারী। একই সাথে আম্মাজান আয়েশা (রা.) এবং আলী (রা.)_এর সেনাবাহিনীতে ঢাকা দিয়ে ছিলো। রাতের আঁধারে তারাই উভয় পক্ষের লোকদের উপর তীর নিক্ষেপ করে যুদ্ধের দামামা বাঁধিয়ে দেয় যা ইতিহাসে উটের যুদ্ধ নামে পরিচিত লাভ করে। এই যুদ্ধের শুরুতেই সাবীয়ীদের নিক্ষিপ্ত একটি তীর তালহার পায়ে বিঁধে যায়। ক্ষত স্থান থেকে রক্ত পড়া কোনো ক্রমেই বন্ধ হচ্ছে না দেখে কা'কা ইবনে আমর তাঁকে অনুরোধ করলেন বসরার 'দারুল ইলাজে'(হাসপাতালে) গমনের জন্য। তাঁরই অনুরোধে তিনি একজন দাসকে সাথে নিয়ে দারুল ইলাজে চলে যান। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর শরীর রক্তশূণ্য হয়ে যায়। সেখানে পৌঁছার কিছুক্ষণ পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। হিজরি ৩৬ সনের জমাদিউল আওয়াল মতান্তরে ১০ জমাদিউস সানী ৬৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। বসরাতেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

## ■ ০৬) যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.):

- উত্তপ্ত পাথরের উপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে এমনভাবে প্রহার করতেন যে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যেত। তবুও তিনি বলতেন,'যত আঘাত করুন না কেনো আমি পুনরায় কাফির হতে পারি না।'

**নাম ও পরিচয়ঃ**

তাঁর নাম যুবাইর, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ এবং উপাধি "হাওয়ারিয়্যু রাসূলিল্লাহ"। পিতার নাম আওয়াম এবং মাতার নাম সাফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব। মা সাফিয়্যা ছিলেন রাসূলে করীম (সা.)_এর ফুফু।সেই তিনি ছিলেন রাসূলের ফুপাতো ভাই।

**জন্মঃ**

যুবাইর ইবনে আওয়াম হিজরতের আটাশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবকালীন জীবন প্রসঙ্গে তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে এটা নিশ্চিত যে প্রথম থেকেই তাঁর মা তাঁকে এমনভাবে লালন-পালন করেছিলেন, যাতে বড় হয়ে তিনি একজন দুঃসাহসি, দৃঢ়-সংকল্প ও আত্মপ্রত্যয়ী মানুষে পরিণত হন।

**ইসলাম গ্রহণঃ**

যুবাইর (রা.) মাত্র ষোল বছর বয়সেই ইসলাম কবুল করেন। প্রথম পর্বের ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যন্য ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

**অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকারঃ**

প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কার অন্যান্য মুসলমানদের মতো তিনিও অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার। তাঁর চাচা তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরানোর জন্য প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু একত্ববাদের ছোঁয়া যার অন্তরে একবার লেগে যায় তা কি আর মুছে ফেলা যায়? ক্রোধ হয়ে চাচা আরো কঠোরতা শুরু করে দেন উত্তপ্ত পাথরে চিউ করে শুইয়ে দিয়ে প্রচুর প্রহার করতেন।তবুও তিনি সরে আসে নি।

**জিহাদে অংশ গ্রহণঃ**

বদর,উহুদ সহ বেশ কয়েকটি জিহাদে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। উমার (রা.) বলেন, যুবাইর (রা.) দ্বীনের রুকুনসমূহের একটি বিরাট রুকন। বদরের যুদ্ধে তিনি অটল ও অবিচল ছিলেন।

**মু'মিনীন আয়েশা (রা.) বলেন,**

**"أَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْ ا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ**

**অর্থঃ** যারা আহত হওয়ার পর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে '_ এ আয়াতে আবু বকর (রা.) ও যুবাইর (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে। **(সূরা আলে-ইমরান ১৭২ আয়াত)**

**বদর প্রান্তরে** তিনি এত সাংঘাতিকভাবে লড়াই করেছিলেন যে,তাঁর তরবারী ভোঁতা হয়ে গিয়েছিলো এবং আঘাতে আঘাতে তাঁর গোটা দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে হয়ে গিয়েছিলো। এ দিনের একটি ক্ষত এত গভীরে ছিলো যে চিরদিনের জন্য তা একটি গর্তের মতো চিহ্ন হয়ে

গিয়েছিলো।তাঁর পুত্র উরওয়া বলেন,"আমরা সেই গর্তে আঙুল প্রবেশ করিয়ে খেলা করতাম।" এই যুদ্ধে তিনি হলুদ রঙের পাগড়ী পরিহিত ছিলেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,
**" আজ ফিরিশতাগণও এ বেশে উপস্থিত হয়েছেন।"**

**খন্দকের যুদ্ধে মুসলিম মহিলাগণ যেখানে** অবস্থান করছিলেন সেই দিকটির প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন যুবাইর (রা.)। রাসূল (সা.) পরপর তিনবার জিজ্ঞেস করেছিলেন তোমাদের মধ্যে কে খবর নিয়ে আসতে পারবে? প্রত্যেকবারই যুবাইর (রা.) হাত তুলতেন। রাসূলে করীম (সা.) তাঁর আগ্রহে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন,
**" প্রত্যেক নবীরই একজন হাওয়ারী থাকে, আমার হাওয়ারী যুবাইর।"**

হিজরীর ৩৬ সনের জমাদিউল উখরার ১০ তারিখে আলী (রা.),তালহা (রা.)_এর পরিস্থিতি অবগত হয়ে স্বীয় সৈন্যদল প্রস্তুত করে অগ্রসর হন এবং উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
হযরত আলী (রা.) একাকী ঘোড়ায় আরোহণ করে ময়দানের স্থলে এসে হযরত যুবাইর (রা.) কে ডেকে বলেন,
" হে আবু আব্দুল্লাহ! সেই দিনের কথা তোমার মনে আছে কি? যখন আমরা উভয়ে পরস্পরে হাতে হাত মিলিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)_এর সম্মুখ দিয়ে গমন করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) তোমার কাছে জিজ্ঞেস করলেন,"তুমি আলীকে বন্ধু মনে কর কি?"

তুমি উত্তর দিয়েছিলে "হ্যা,ইয়া রাসূলুল্লাহ! " ভালোমতে স্মরণ করো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বল্লেন, "হে।যুবাইর, তুমি একদিন আলীর বিরুদ্ধে না হোক যুদ্ধ করবে।"

হযরত যুবাইর (রা.) উত্তর দিলেন হ্যা,তিনি বলেছিলেন। যদিও আমার তা স্মরণে ছিলো না কিন্তু এখন আমার স্মরণ হয়েছে।

**শাহাদাত বরণ ও সমাহিতঃ**
হযরত আলী (রা.) মাত্র ঐ কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিজ দলে প্রত্যাবর্তন করেন।ঐদিকে হয়রত যুবাইর (রা.)_এর অন্তরে এক বিপ্লব সৃষ্টি হয়।সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যাবতীয় ইচ্ছা-আকাংক্ষার পরিবর্তন হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যুদ্ধ বন্ধের বৃথা চেষ্টা কটে একাকী বসরার দিকে রওনা হন। পথিমধ্যে ইবনে হুরমুজ তাঁকে হত্যা করেন।

মৃত্যুকালে হযরত যুবাইর (রা.)_এর বয়স হয়েছিলো চৌষট্টি বছর। হিজরি ৩৬ সনে তিনি শহীদ হন এবং ওয়াদিস সাবায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

## ■ ০৭) আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.):

তুমি যা দিলে আল্লাহ তাতেও বরকত দিন,
আর যা রাখলে আল্লাহ তাতেও বরকত দিন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)_ এর জীবদ্দশায় মদিনা মুনাওয়ারাতে যে সামান্য কয়জন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ফতোয়া দিতেন,মুসলিমজাতির দ্বীনি সমস্যার সমাধান দিতেন তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। জাহেলী যুগে যাঁর নাম ছিলো আবদে আমর,ইসলাম গ্রহণের পর প্রিয় নবী রাসূল (সা.) তাঁর নাম রাখেন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ইসলাম গ্রহণ করেন রাসূল (সা.)_এর নিয়মতান্ত্রিকভাবে দারুল আরকামে দাওয়াত শুরুর পূর্বে। (দারুল আরকাম হলো আল-আরকাম ইবনে আবদে মানাফ আল-মাখযূমীর বাড়ি। মক্কার এই বাড়িতেই রাসূল (সা.) ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিমদের শিক্ষা দিতেন।ইসলামের সর্বপ্রথম অফিস এটাই)

**নির্যাতনঃ**

ইসলাম গ্রহণ করার কারনে তাঁকেও অনেক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিলো। কোনো কষ্ট নির্যাতনই তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে পারে নি বরং সবকিছু সহ্য করেই তিনি অপরাপর মুসলিমদের মতো অটল ও অবিচল থেকেছেন।

**হিজরতঃ**

হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) আনুষ্ঠানিকভাবে একেক মুহাজিরকে একেক আনসারীর সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। সেই সূত্র ধরেই মদীনার সাদ ইবনে রাবী আনসারীর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব গড়ে দেন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)_এর। তখন সাদ আল-আনসারী (রা.) বলেন,

“হে আমার ভাই! মদীনার লোকদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশি ধনবান মানুষ। আমার ২টি বাগান এবং দুজন স্ত্রী আছে। আপনি দেখুন কোন বাগানটি পছন্দ, সেটাই আপনাকে দিবো আর দেখুন আপনার কোন স্ত্রী ভালো লাগে? আমি তাকে তালাক দিয়ে দিবো যেন আপনি তাকে বিয়ে করতে পারেন।”

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ খুশি হয়ে বলেন,
“ধন্যবাদ হে আনসারী ভাই! আল্লাহ তায়ালা আপনার পরিবার-পরিজনের মধ্যে এবং ধন-সম্পদের মধ্যে বরকত দান করুন। আপনি দয়া করে আমাকে বাজারের পথ চিনিয়ে দিন।” পরে তিনি ব্যবসা করেন এবং লাভবান হয়ে বিবাহ করেন।

**আল্লাহর পথে ব্যয়ঃ**

রিক্ত হাতে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) মদীনায় এসে ব্যবসা শুরু করেন এবং প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হন।সব কিছু আবার আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ও করেন।

**মৃত্যু বরণঃ**

ইবনে সা'দের মতে,আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) হিজরী ৩২ সনে ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। তবে ইবনে হাজারের মতে, তিনি ৭২ বছর জীবিত ছিলেন। ইবনে হাজার এ কথাও উল্লেখ করেন,উসমান অথবা যুবাইর ইবনুল আওয়াম তাঁর জানাযার ইমামতি করেন এবং তাঁকে মদীনার বাকি গোরস্থানে দাফন করা হয়। গোরস্থান পর্যন্ত তাঁর লাশ বহনকারীদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) ও ছিলেন।

হাদীসের গ্রন্থসমূহে অন্তত ৩৫৫৬ টি বর্ণনার সাথে আব্দুর রহমান ইবনে আউফের নাম দেখা যায়। তন্মধ্যে মুয়াত্তাতে ৩৭টি; বুখারীতে ৫৩ টি এবং মুসলিমে ৪৭টি।

## ■ ০৮) সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.):

- অবশেষে তিনি মায়ের মুখের উপর বলে দিতে বাধ্য হলেন: “মা,আপনার মতো হাজরটি মাও যদি আমার ইসলাম ত্যাগ করার বিষয়ে জিদ ধরে পানাহার ছেড়ে দেয় এবং প্রান বিসর্জন দেয়,তবুও সত্য দ্বীন ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।”

**নাম ও পরিচিতিঃ**

তাঁর নাম আবু ইসহাক সা'দ,পিতার নাম আবু ওয়াক্কাস মালিক। ইতিহাসে তিনি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস নামে পরিচিত। কুরাইশ বংশের বনু যুহরা শাখার সন্তান। মাতার নাম “হামনা” বিনতে আবু সুফিয়ান। পিতা-মাতা উভয়েই ছিলেন কুরাইশ বংশের। সা'দের পিতা আবু ওয়াক্কাস ইসলাম কবুল করে রাসূলে করীম (সা.)_এর সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। মাতা হামনাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটি অন্য রকম

ছিলেন। টানা ৩ দিন পানাহার বর্জন এবং ছায়ায় না এসেও তার সন্তানকে ইসলাম থেকে দূরে সরাতে পারেন নি,তখন তিনি নিজেই ইসলাম গ্রহণ করেন।
সা'দের ভাই উমাইর (রা.) রাসূলের নবুওয়ত প্রাপ্তির কিছুদিন পরেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম।

**ইসলাম গ্রহণঃ**

আবু বকর (রা.) ছিলেন সা'দের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আবু বকরের দাওয়াতেই তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন। সা'দ (রা.) বলেন ইসলাম গ্রহণের পর আমি নিজেকে তৃতীয় মুসলমান হিসেবে দেখতে পেলাম। আসলে তিনি নবী করীম (সা.)_এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সাথে সাথেই ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু অনেকের মতোই তখন তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন নি।

**জিহাদে অংশগ্রহণঃ**

আল্লাহর পথে জিহাদে সা'দ (রা.)_ এর ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অসীম বীরত্ব ও সাহসিকতা ইসলাম শত্রুদের খুব ভয়ংকর পরিনতির দিকে ঠেলে দিয়েছিলো। তিনিই প্রথম মুসলিম যিনি আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেন।তিনি নিজেও বলতেন।

**– "আমি প্রথম আরব যে আল্লাহর জন্য তীর চালনা করেছিলাম।"**

■ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁরা ইসলামের প্রচার প্রসারের কাজ চালিয়ে যান এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে। তাঁদের এ চরম দারিদ্র্য সম্পর্কে সা'দ বলেন,
"আমরা নবী করীম (সা.)_ এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতাম, আমরা জীবন ধারন করতাম আর আমাদের বিষ্ঠা হতো উট ছাগলের বিষ্ঠার মতো।" **(বুখারী ও মুসলিম)**

**পারস্য অভিযানঃ**

আবু উবাইদা ও মুসান্নার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী পারস্যের কিসরা বাহিনীকে পরাজিত করে ইরাক জয় করেন। পরবর্তীতে সা'দ (রা.) মদীনা থেকে তাঁর বাহিনী নিয়ে কাদেসিয়া গমন করেন। তাঁর গমনের পূর্বেই মুসান্না মারা যায়। কাদেসিয়া প্রান্তরে সা'দের নেতৃত্বে মুসলিম ও পারস্য বাহিনীর মধ্যে চূড়ান্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সা' দ সংবাদ পেলেন,শাহানশাহ ইয়াজিদগিরদ রাজধানী মাদায়েন থেকে সব মূল্যবান সম্পদ সরিয়ে নিচ্ছে। সা'দ দ্রুত সেন্যবাহিনী নিয়ে মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হলেন। দিজলা তীরে এসে দেখেন,

ইরানিরা পুলটি আগেই ধ্বংস করে দিয়েছেন। তখনই ঘটলো আল্লাহর বিশ্বাসে বিশ্বাসী হওয়ার এক আশ্চর্য ঘটনা। সা'দ (রা.) আল্লাহর নাম নিয়ে নদীতে ঘোড়া নামিয়ে দিলেন এবং একে একে সব সেনারাও তাঁদের ঘোড়াগুলো নদীতে নামিয়ে দেয়। আলহামদুলিল্লাহ খুব সহজেই তাঁরা নদী পার হয়ে যায়। সা'দ নির্জন শ্বেত দালানে প্রবেশ করলেন। পরিবেশ ছিলো খুবই ভয়াবহ। দালানের প্রতিটি কক্ষ ছিলো যেন শিক্ষা ও উপদেশের স্মারক। সেই মুহূর্তে সা'দের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো সূরা দুখানের আয়াতগুলো,

**كَمۡ تَرَكُواْ مِن جَنَّٰتٖ وَعُيُونٖ[আয়াত:২৫)**

**ওরা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত বাগান ও ঝরনা,**

كَمۡ 'খাবরিয়্যাহ' (খবরসূচক) যা আধিক্য বুঝাতে ব্যবহার হয়। নীল-নদের উভয় পাশের্ব পর্যাপ্ত পরিমাণে বাগান, ক্ষেত এবং উঁচু উঁচু অট্টালিকা ও প্রতিপত্তির বহু নিদর্শন ছিল। সব কিছুই এই দুনিয়াতেই থেকে গেল এবং শিক্ষা ও উপদেশ স্বরূপ কেবল ফিরআউন ও তার জাতির নাম রয়ে গিয়েছে।

**وَعُيُونٖ وَزُرُوعٖ وَمَقَامٖ كَرِيمٖ(আয়াত:২৬)**

**শ্যামল শস্যক্ষেত ও সুরম্য বাসস্থান**

**وَنَعۡمَةٖ كَانُواْ فِيهَا فَٰكِهِينَ(আয়াত:২৭)**

**আর নানা বিলাস-সামগ্রী, যাতে তারা আনন্দ উপভোগ করবেন।**

**كَذَٰلِكَۖ وَأَوۡرَثۡنَٰهَا قَوۡمًا ءَاخَرِينَ(আয়াত:২৮)**

**এরূপই ঘটেছিল[১] এবং আমি এ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী করলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। [২]**

كَذَٰلِكَ অর্থাৎ, এ ব্যাপারটা ঐভাবেই ঘটেছে, যেভাবে বর্ণনা করা হল।

[২]কারো কারো নিকট এ থেকে লক্ষ্য হল বানী-ইস্রাঈল। তবে কারো কারো নিকট বানী-ইস্রাঈলের পুনরায় মিশর ফিরে আসার কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়। অতএব মিশর রাজ্যের উত্তরাধিকারী অন্য কোন জাতি হয়ে থাকবে, বানী-ইস্রাঈল নয়।

সা'দ শ্বেত দালানে প্রবেশ করে আট রাকাত "সালাতুল ফাতহ" আদায় করেন। এবং বিজয় লাভ করেন।

**মর্যাদাঃ**

রাসূলে করীম (সা.) খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীদের নিকট সা'দের গুরুত্ব ও মর্যাদা ছিলো অতি উচ্চ। তাঁরা তাঁর অভিমতকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতেন। একবার সা'দ (রা.) মোজার উপর মাসেহ জনিত একটি হাদিস বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার তাঁর বাবার কাছে হাদীসটির সত্যতা যাচাই করতে গেলে উমার (রা.) জিজ্ঞেস করলেন,হাদীসটি কি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস থেকে শুনেছো? আব্দুল্লাহ ইবনে উমার বলেন হ্যা। সা'দ যখন তোমাদের কোনো হাদীস বর্ণনা করেন তখন এ বিষয়ে অন্য কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। রাসূলের জীবদ্দশায় বিলালের অনুপস্থিতে সা'দ তিনবার আযান দিয়েছেন। নবী করীম (সা.) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন,আমার সঙ্গে বিলালকে না দেখলে তুৃি আযান দিবে।

**হাদীস বর্ণনাঃ**

নবী করীম (সা.) থেকে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর কাছ থেকে তাঁর সন্তানেরা যেমন,ইবরাহীম, আমের, মুস'আব, মুহাম্মদ, আয়েশা এবং বিশিষ্ট সাহাবীরা যেমন, আয়েশা,ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, জাবীর (রা.) এবং বিশিষ্ট তাবেয়ীরা যেমন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব,আবু উসমান আন-নাহদী,কায়েস ইবনে আবু হাযিম, আলকামা,আহনাফ ও অন্যান্যরা হাদীস বর্ণনা করেন।

- **হাদীসের কিতাবসমূহে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের নাম কমপক্ষে ২৫৯৭ বার দৃশ্য হয়। তন্মধ্যে মুয়াত্তাতে ২০; বুখারীতে ৩০ ;মুসলিমে ৪২ এবং আবু দাউদে ১৭ বার।**

**শাহাদাত বরণ ও সমাহিতঃ**

সা'দ (রা.) মদীনা থেকে দশ মাইল দূরে আকীক পাহাড়ে কিছুদিন রোগাক্রান্ত থাকার পর মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যু তারিখ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। হিজরি ৫৫ সনে ৮৫ বছর বয়সে তাঁর ইন্তিকাল হয়। গোসল ও কাফনের পর লাশ মদীনায় নিয়ে আসা হয়। মদীনার তৎকালীন গভর্নর মারওয়ান জানাযার ইমামতি করেন। সা'দের ইন্তিকালের পর উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা ও অন্যান্য আযওয়াজে মুতাহ্হারাহগণ বলে পাঠালেন, তাঁর লাশ মসজিদে

নিয়ে আসা হোক,যাতে আমরা জানাযায় অংশ গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু লোকেরা লাশ মসজিদে নেওয়া যেতে পারে কিনা এ বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দে ভুগছিলো। আয়েশা (রা.) একথা জানত পেরে বল্লেন, তোমরা এত শীগ্রই ভুলে যাও! নবী করীম (সা.) তো সুহাইল ইবনে বায়গদার জানাযা এই মসজিদেই আদায় করেছেন।" অতঃপর লাশ উম্মাহাতুল মু'মিনীনের কক্ষের কাছে আনা হলো এবং তাঁরা জানাযার সালাত আদায় করলেন।

**অসিয়তঃ**

ইন্তিকালের সময় সা'দ (রা.) বহু অর্থ-সম্পদের মালিক ছিলেন। তা সত্বেও তিনি একাকি অতি পুরাতন পশমী জুববা চেয়ে নিয়ে বল্লেন, এ দিয়েই আমাকে কাফন দিবে।

**ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেনঃ**

নবী করীম (সা.)_এর সাহাবীদের মধ্যে চারজন ছিলেন সর্বাধিক কঠোর। উমার (রা.); আলী (রা.) ; যুবাইর (রা.) এবং সা'দ (রা.)।

## ■ ০৯) সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.):

- সাঈদ (রা.) বলেন, তখন মুসলিম বাহিনীর ভেতর থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে এসে আবু উবাইদাকে বলল, "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ মুহূর্তে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করবো। নবী করীম (সা.)_এর কাছে পৌঁছে দিতে হবে এমন কোনো বাণী কি আপনার নিকট রয়েছে? আবু উবাইদা বলেন, হ্যা আছে। তাঁকে আমার ও মুসলিমদের সালাম পৌঁছে দিয়ে বলবেন,হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রতিপালক আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন,তা আমরা সত্যিই পেয়েছি।"

**নাম ও পরিচিতিঃ**

তাঁর নাম সাঈদ, উপনাম আবুল আ'ওয়ার। পিতার নাম যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল বিন আব্দুল উজ্জা বিন রিবাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন জারবাহ বিন আদী কাব বিন লুই কুরাশী আদরি। মাতার নাম ফাতিমা বিনতু হাজাবাহ বিন মালীহ খোযায়ী।

উর্ধ্ব পুরুষ কা'ব ইবনে লুই-এর মাধ্যমে নবী করীম (সা.)_ এর নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে।

যায়েদের পিতা জাহিলী যুগের মক্কার মুষ্টিমেয় কল্যানকামী ব্যক্তিদের একজন যাঁরা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই শিরক ও পৌত্তলিকতা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখেন এমনকি মুশরিকদের হাতে জবেহ করা পশুর গোশতও পরিহার করতেন।

■ যায়েদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করে প্রতিশ্রুত নবীকে সন্ধ্যান করে বের করার জন্য দ্রুত কদমে এগিয়ে চল্লেন।তিনি যখন মক্কা থেকে বেশ কিছু দূরে, তখনই আল্লাহ তা'য়ালা নবী মুহাম্মদ (সা.) কে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে দুনিয়াতে প্রেরণ করলেন। কি
যায়েদ তাঁর সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হলেন। কারন মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই একদল বেদুঈন ডাকাত তাঁর উপর চড়াও হয়ে তাঁকে হত্যা করে। এভাবে তিনি নবী করীম (সা.) এর দর্শন লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দোয়া করেন–

**أَللّٰهُمَّ إِنِّي كُنْتَ حَرَّمْتَنِيْ مِنْ هٰذَا الْخَيْرِ فَلَا تَحْرِمْ مِنْهُ إِبْنِيْ سَعِيْدا**

**অর্থঃ "হে আল্লাহ!** যদিও এ কল্যান থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন,আমার পুত্র সাঈদকে এ থেকে আপনি বঞ্চিত করবেন না।"

আল্লাহ তা'য়ালা যায়েদের এ প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। নবী করীম (সা.) লোকদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। প্রথম ভাগেই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)_ এর উপর দাওয়াত কবুল করেছিলেন সাঈদ তাঁদের মধ্যে একজন। শুধু তিনি না তাঁর স্ত্রী উমার ইবনুল খাত্তাবের বোন ফাতিমা বিনতুল খাত্তাবও ইসলাম গ্রহণ করেন।
এদের ধারাবাহিকতায় উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) ইসলামের ছায়াতলে চলে আসেন।

**নির্যাতনের শিকারঃ**

ইসলাম গ্রহণের কারনে কুরাইশ বংশের এ যুবকও অন্যদের মতো জুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচারের শিকার হন। কুরাইশরা তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরানো দূরে থাক, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে কুরাইশদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন ইসলামের ছায়াতলে।

**ইসলামের খিদমতঃ**

সাঈদ (রা.) তাঁর যৌবনের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেন ইসলামের খিদমতে। তিনি যখন ইসলাম কবুল করেন তাঁর বয়স ২০ বছরও অতিক্রম করেনি। একমাত্র বদর যুদ্ধ ছাড়া নবী করীম (সা.)_এর সাথে সব যুদ্ধেই তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

**আশ্চর্য ঘটনাঃ**

উমাইয়া যুগে সাঈদ ইবনে যায়দের (রা.) কে কেন্দ্র করে এক আশ্চর্য জনক ঘটনা ঘটে। যা দীর্ঘদিন ধরে মদীনাবাসীদের মুখে শোনা যেত। ঘটনাটি হলো, আরওয়া বিনতে উওয়াইস নীচের এক নারী দুর্নাম রটাতে থাকে যে, সাঈদ ইবনে যায়েদ তার ভূমির একাংশ জবরদস্তি করে নিজ ভূমির সাথে দখল করে নিয়েছেন। যেখানে সেখানে একথা বলে বেড়াতেন। এক পর্যায়ে সে ৃদীনাবাসী মারওয়ান ইবনুল হিকামের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করলে যাচাই করে দেখার জন্য কতিপয় লোককে সাঈদের কাছে প্রেরণ করেন। নবী করীম (সা.)_ এর সাহাবী সাঈদের জন্য বিষয়টি বেদনাদায়ক ছিলো। তিনি বললেন,

**مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.**

**অর্থঃ** “ যে ব্যক্তি একবিঘত পরিমাণ জমি জুলুম করে নিবে,কিয়ামতের দিন সাত তবকা যমীন তার গলায় লটকায়ে দেওয়া হবে।”

হে আল্লাহ! সে ধারনা করেছে আমি তার উপর জুলুম করেছি, যদি সে মিথ্যুক হয় তার চোখ অন্ধ করে দাও।যে কূপ নিয়ে সে আমার সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত তার মধ্যেই তাকে নিক্ষিপ্ত করো।আমার পক্ষে এমন অলোক প্রকাশ করে দাও যাতে মুসলিমদের মাঝে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমি তার উপর কোনো অত্যাচার জুলুম করিনি।

এ ঘটনার কিছু দিন পরেই আকীক উপত্যকা এমনভাবে প্লাবিত হলো যে আর কখনো এরকম হয় নি। ফলে দু'যমীনের মধ্যখানের বিতর্কিত অদৃশ্য বিষয়টি এমনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়লো যে মুসলিমরা বুঝতে সক্ষম হলো যে সাঈদ সত্যবাদী। একমাস পার না হতেই মহিলাটিও অন্ধ হয়ে যায়। আর এই অবস্থাতেই একদিন কূপে পরে মারাও যায়।

**মর্যাদাঃ**

তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীদের অন্যতম সাঈদ ইবনে হাবীব বলেন, নবী করীম (সা.)_এর কাছে আবু বকর; উমার; উসমান; আলী ;সা'দ; সাঈদ; তালহা ; যুবাইর ও আব্দুর রহমান ইবনে আওফের স্থান ও গুরুত্ব ছিলো একইরকম। যুদ্ধের ময়দানে তাঁরা থাকতেন নবী করীম (সা.)_এর সামনে এবং সালতে জামা'আতের থাকতেন তাঁর পিছনে।

**হাদীস বর্ণনাঃ**

সাঈদ ইবনে যায়েদের কাছ থেকে সাহাবীদের মধ্যে ইবনে উমার ; আমর ইবনে হুরাইস; আবু আত-তুফাইল এবং আবু উসমান আন-নাহদী ; সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ; কায়েস ইবনে আবু হাযেম প্রমুখ প্রখ্যাত তাবেয়ীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

**মৃত্যু বরণঃ**

ওয়াকিদী বলেন, তিনি আকীক উপত্যকায় মৃত্যু বরণ করেন এবং মদীনায় তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যু সন হিজরী ৫০ মতান্তরে হিজরী ৫১ অথবা ৫২। সত্তর বছর তিনি জীবিত ছিলেন। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস তাঁকে গোসল দিয়ে কাফন পড়ান এবং আবু আব্দুল্লাহ ইবনে উমার সালাতে জানাযার ইমামতি করেন। তবে হাইসাম ইবনে আদীর মতে, তিনি কুফায় মৃত্যু বরণ করেন এবং বিশিষ্ট সাহাবী মুগীরা ইবনে শু'বা তাঁর জানাযার ইমামতি করেন।

**হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্টতাঃ**

সাঈদ ইবনে যায়েদের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসের ১০৯৫ টি দেখা যায়। তন্মধ্যে মুয়াত্তাতে ১; বুখারীতে ১২; মুসলিমে ১১; আবু দাউদে ১০ এবং তিরমিজিতে ১৬।

## ■ ১০) আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ্ (রা.):

- যখন তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, তিনি তরবারির এক আঘাতে লোকটির মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। লোকটি মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। লোকটি কে? সে আর কেউ নয়। সে আবু উবাইদার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনুল জাররাহ্!

**তাঁর প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (সা.) বলেন,**

**“ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنٌ وَ اَمِيْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ.**

**অর্থঃ** প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি রয়েছে। আর এ মুসলিম জাতির পরম বিশ্বাসী ভাজন ব্যক্তি হলো আবু উবাইদা।”

**নাম ও পরিচিতিঃ**

আবু উবাইদার পুরো নাম আবীর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনুল জাররাহ্ আল-ফিহরী আল কুরাইশী। তবে শুধু আবু উবাইদা নামে তিনি সকলের কাছে পরিচিত। তাঁর পঞ্চম উর্ধ্ব পুরুষ "ফিহরের" মাধ্যমে নবী করীম (সা.) _এর নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। তাঁর মা ও ফিহরী খান্দানের মেয়ে। সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন।

**উমারের মন্তব্যঃ**

আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের (রা.) মন্তব্য হলো, কুরাইশদের তিন ব্যক্তি অন্যান্যদের তুলনায় সুন্দর চেহারা,উত্তম চরিত্র ও লজ্জাশীলতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা তোমাকে কোনো কথা বল্লে মিথ্যা বলবেন না,আর তুমি তাদেরকে কিছু বল্লে তাঁরা তোমাকে মিথ্যুক মনে করবেন না। তাঁরা হচ্ছেন আবু বকর সিদ্দীক; উসমান ইবনে আফফান ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ্ (রা.)।

**ইসলাম গ্রহণঃ**

ইসলাম প্রচারের প্রথম ভাগেই যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আবু উবাইদা ছিলেন অন্যতম। আবু বকর (রা.)_এর ইসলাম গ্রহণের পরের দিনই তিনি ইসলাম কবুল করেন। আবু বকরের হাতেই তিনি তাঁর ইসলামের ঘোষণা দেন। তারপর তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ; উসমান ইবনে মাজউদ; আল-আরকাম ইবনে আবিল আরকাম ও তাঁকে সাথে করে নবী করীম (সা.)_ এর দরবারে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁরা সকলেই একত্রে ইসলামের ঘোষণা দেন। এভাবে তাঁরাই হলেন মহান ইসলামি ইমারতের প্রথম ভিত্তি।

**নবীর সাহচর্যঃ**

ইসলাম গ্রহণের পর নবী করীম (সা.)_এর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আবু উবাইদা সর্বক্ষেত্রে ছায়ার মতো সব সময় তাঁকে অনুসরণ করেছেন। সাকীফায়ে বনী সায়েদাতে খলিফা নিযুক্ত প্রসঙ্গে তুমুল বাক-বিতন্ডা শুরু হয়। আবু উবাইদা আনসারদের লক্ষ করে তাদেরকে সতর্ক করে বলেন, ওহে আনসার সম্প্রদায়! তোমরাই প্রথম সাহায্যকারী। আজ তোমরাই প্রথম পার্থক্য সৃষ্টি কারী হয়ো না।" এক পর্যায়ে আবু বকর (রা.) আবু উবাইদাকে বলেন, আপনি হাত সম্প্রসারিত করুন,আমি আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করি।

**সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিযুক্তিঃ**

আবু বকর (রা.) খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণের পর হিজরি **১৩** সনের সিরিয়া অভিযান পরিচালনা করেন। সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেন আবু উবাইদাকে। হিজরী **১৭** সনে খালিদ সাইফুল্লাহকে দিমাশকের আমীর ও ওয়ালীর পদ থেকে বহিষ্কার করে খলিফা উমার আবু উবাইদাকে তাঁর স্থালে নিযুক্ত করেন। খালিদ সাইফুল্লাহ জনগণকে বলেন,তোমাদের খুশি হওয়া উচিত যে, আমীনুল উম্মাহ তোমাদের ওয়ালী।”

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

**لِكُلِّ اُمَّةٍ أَمِيْنٌ وَ أَمِيْنُ هٰذِهٰ الْأُمَّةِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ**

**অর্থঃ** প্রত্যক উম্মাতের একজন করে আমীন ছিলো,আর আমার উম্মাতের আমীন (আমানাতদার) হচ্ছে আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ্ (রা.)।

**উমারের পত্র পেয়ে উত্তরঃ**

আমার এ পত্রখানি যদি রাতের বেলা আপনার নিকট পৌঁছায় তাহলে সকাল হওয়ার পূর্বেই রওনা দিবেন। আর যদি দিনের বেলা পান তাহলে সন্ধ্যার পূর্বেই যাত্রা করবেন। তিনি উত্তরে বলেন,আমি আপনার প্রয়োজনটা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আমিতো মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে অবস্থান করছি।তাঁদের উপর যে বিপদ পতিত হয়েছি আমি নিজেকে এ থেকে রক্ষা করার প্রত্যাশি নই।

**উমার (রা.)** চিঠির উত্তর পেয়ে ব্যকুলভাবে কেঁদেছিলেন যে, তাঁর দুচোখ থেকে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরে পড়লো। তাঁর এই কান্না দেখে তার আশেপাশের সবাই তাঁকে জিজ্ঞেস করছিলেন,আমীরুল মু'মিনীন, আবু উবাইদা কি মৃত্যু বরণ করেছেন? তিনি বলেছিলেন না। তবে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে।”

**মৃত্যু বরণঃ**

সকলকে সালাম জানিয়ে আবু উবাইদা (রা.) তাঁর ভাষণ সমাপ্ত ঘোষণা করেন, অতঃপর মুয়া'য ইবনে জাবাল (রা.)_ এর দিকে তাকিয়ে বলেন,মুয়া'য! তুমি সালাতের ইমামতি করো। এর পরপরই **১৮** হিজরিতে তাঁর রূহটি পবিত্র দেহ থেকে রবের সান্নিধ্যে চলে যায়।

**জানাযা ও সমাহিতঃ**

এরপর জনগণ একত্রিত হয়ে আবু উবাইদার লাশ বের করে নিয়ে আসে মুয়া'য ইবনে জাবালের ইমামতিতে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।মুয়া'য ইবনে জাবাল,আমর ইবনে আস ও দাহহাক্ ইবনে কায়েস কবরে নেমে তাঁর লাশ মাটিতে শায়িত করেন।

**আর এভাবেই রাসূলে করীম (সা.)_এর** দুনিয়াতেই যেই দশজনকে একই বৈঠকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন যাদেরকে **"আশারায়ে মুবাশশারাহ্" বলা হয়** তাঁদের ধারার সমাপ্তি ঘটে।

**আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) থেকে বর্ণিতঃ** তিনি বলেন রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

" আবু বকর জান্নাতী; উমার জান্নাতি ; উসমান জান্নাতি ; আলী জান্নাতি; তালহা জান্নাতি; যুবাইর জান্নাতি; আব্দুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতি; সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতি; সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতি এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ্ জান্নাতি।"

## ■ ১১) বিলাল ইবনে রাবাহ (রা.):

- রাসূলুল্লাহ (সা.)_এর ইন্তিকালের পর আবু বকর (রা.)_এর খিলাফত কালেও বিলাল (রা.) মুয়াযযিন হিসেবে বহাল থাকেন। কিন্তু উমার (রা.) তাঁর খিলাফাত কালে তাঁকে উক্ত পদে বহাল থাকতে অনুরোধ করলেও তিনি রাযি হন নি বরং সিরিয়ার অভিযানসমূহে গমন করেন এবং জীবনের শেষাংশ সেখানেই অতিবাহিত করেন।

বেলাল (রা.) কে নবী করীম (সা.) জান্নাতে একটি ঘরের সুসংবাদ দান করেন। কেননা তিনিও ছিলেন সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী দলের মধ্যে অন্যতম। ইসলাম গ্রহণ করার কারনে অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। তিনি যেহেতু একজন দাস ছিলেন, উনার মনিব দ্বিপ্রহরে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপর চিৎ করে শয়ন করিয়ে বুকে পাথর রেখে দিতেন এবং বলতো ধর্ম ত্যাগ না করলে তাঁকে এভাবেই হত্যা করা হবে। কিন্তু তিনি একটুও পিছপা হন নি।সর্বদা বলেছেন আহাদ, আহাদ। আল্লাহ এক আল্লাহ এক।

**যার কারনেই আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছিলেন।**

## ■ ১২) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রা.):

- ৪৬ বছর পর লাশটি আবার কবর থেকে তোলা হয়। জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন, কবরটি ছিলো একটি পানির নালার ধারে। একবার প্লাবনের সময় তাতে পানি প্রবেশ করে। কবরটি পুনরায় খোড়া হয়। দেখা গেলো,আব্দুল্লাহর মুখে, যেখানে আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর একটি হাত সেই ক্ষতের উপর। হাতটি সরিয়ে দিলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। হাতটি আবার সেখানে রেখে দিলে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে গেলো।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রা.) জান্নাতি।

**জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,**
উহুদ যুদ্ধের দিন যখন আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম (রা.) শহীদ হলেন,তখন রাসূল (সা.) বল্লেন,

**“হে জাবের! আমি কি তোমাকে** ঐ কথা বলবো না, যা আল্লাহ তোমার পিতা সম্পর্কে বলেছেন? আমি বল্লাম কেন নয়?তিনি বল্লেন,আল্লাহ কোনো ব্যক্তির সাথে পর্দার আড়াল ব্যতীত কথা বলেন নি।কিন্তু তোমার পিতার সাথে কোনো পর্দা ব্যতীত কথা বলেছেন এবং িরশাদ করেছেন হে আমার বান্দা! তুমি যা চাওয়ার তা চাও, আমি তোমাকে দিবো।তোমার পিতা বলেছেন হে আমার রব! আমাকে দ্বিতীয় বার জীবিত কর,যাতে আমি তোমার রাস্তায় আবার শহীদ হতে পারি।
আল্লাহ বল্লেন: আমার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে মৃত্যুর পর দুনিয়াতে আর ফেরত আসা যাবে না। তোমার পিতা বল্লো, হে আমার রব! তাহলে আপনি তাঁদেরকে আমার পক্ষ থেকে দুনিয়াবাসীকে আমার এ পয়গাম শুনিয়ে দিয়েন আমি দ্বিতীয় বার শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা করেছিলাম।তখন আল্লাহ তা’য়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন,

**“যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তোমারা তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত। তাঁরা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে রিযিক প্রাপ্ত হয়।”**
**(সূরা আলে-ইমরানঃ ১৬৯ নং আয়াত)**

## ■ ১৩) ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (রা.):

একদিন নবী করীম (সা.)  মিম্বরে বসে সাহাবাদেরকে হেদায়াতের বাণী  শুনাচ্ছিলেন। এমন সময় হাসান ও হুসাইন দুই ভাই লালে লাল রঙের পোশাক পরে একবার পড়ে যায় আবার উঠে।এভাবে নবী করীম (সা.)_এর দিকে  এগিয়ে এলেন এ অবস্থা দেখে নবী করীম (সা.) দ্রুত মিম্বর থেকে নেমে এগিয়ে এলেন এবং বললেন, আমি বাচ্চা দুটিকে একবার পড়ে যায় আবার উঠে এ অবস্থা অবলোকন করে ধৈর্য্যধারণ করতে পারলাম না। আমার কথা বন্ধ করতে হলো এবং তাদেরকে কোলে উঠাতে হলো।

হাসান ও হুসাইন (রা.) জান্নাতে ঐ সমস্ত লোকদের সর্দার হবেন, যারা যৌবনকালে মৃত্যু বরণ করেছে।

**مَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيْيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ،قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهِدُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ الْحَسَنُ و الْحُسَنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ**

**অর্থঃ** আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,হাসান ও হুসাইন (রাঃ) জান্নাতি যুবকদের সর্দার হবে।

হাসান (রাঃ) প্রসঙ্গে নবী করীম (সা.) বলেন, আমার এ সন্তান সাইয়্যেদ (নেতা)
আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের দুটি বিবাদমান দলের মধ্যে ফয়সালা দান করবেন।
**(সহীহ বুখারী)**

ঈমান তিরমিজির বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,
**أَحَبُّ أَهْلِ بَيْتِيْ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ**
**অর্থঃ** আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে হাসান-হুসাইন আমার সর্বাধিক প্রিয়।

**মুসলিম শরীফের** হাদীসে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন,
"হে আল্লাহ! আমি হাসান-হুসাইনকে ভালোবাসি,কাজে আপনিও তাদেরকে ভালোবাসুন এবং যারা তাদেরকে ভালোবাসে তাদেরকেও ভালোবাসুন।"

**জন্ম গ্রহণঃ**

৩য় হিজরী ১৫ রমাযান, ১ লা এপ্রিল ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় হাসান রাঃ জন্ম গ্রহণ করেন। আলী (রা.) প্রথমে তাঁর নাম রেখেছিলেন হারব। রাসূল (সা.) তার নাম পরিবর্তন করে হাসান রাখেন। আনাস (রা.) বলেন,

**হাসান ব্যতীত রাসূল (সা.) এর আকৃতিতে এতো অধিক সাদৃশ্য আর কারো ছিলো না।"**

**হিজরী ৪র্থ সনে** সাবান মাসের ৫ তারিখে মদীনায় নবীর দ্বিতীয় নয়নের মনি হুসাইন (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বনবী হাসানের সময় যা করেছিলেন হুসাইনের বেলাতেও একই কাজ করেছেন। ভূমিষ্ট হওয়ার ৭ দিনের মাথাতেই উভয়ের আক্কিকা সম্পন্ন করেন।

**রাসূল করীম (সা.)_এর ভালোবাসাঃ**

তিনি এবং তাঁর ভাই হাসান (রা.) ছিলেন আহলে বাইতের লোকদের মধ্যে নবী করীম (সা.)_এর সর্বাধিক প্রিয়,সর্বাধিক স্নেহভাজন এবং নিকটতম। তাঁদের প্রসঙ্গেই বিশ্বনবী ইরশাদ করেছেন,

**আহলে বাইতের লোকদের মধ্যে আমার সর্বাধিক প্রিয় হচ্ছে হাসান এবং হুসাইন।**

হাসান এবং হুসাইনকে রাসূল (সা.) না দেখলে পেরেশান হয়ে যেতেন।

হাসান (রা.) অনেক সময় বলতেন, ০৩ টি কারনে মানুষের ধ্বংস হয়,অহংকার; লোভ এবং হিংসা। তিনি বলেন, অহংকারের কারনে মানুষ ধর্মীয় অনুভূতি বিনষ্ট হয়,এ কারনেই ইবলিশ অভিশাপ প্রাপ্ত হয়েছে। আর লোভ হচ্ছে কলবের শত্রু, যে কারনে আদম (আ.) জান্নাত থেকে বঞ্চিত হন। আর হিংসা হলো পাপীদের গোয়েন্দা, এ কারনেই কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছিলো।

**হাসান (রা.) ৫০ হিজরিতে মতান্তরে ৫১ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন।**

**হুসাইনের শাহাদাতের সংক্ষিপ্ত ঘটনাঃ**

মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর জীবদ্দশায় পরবর্তী খলিফা হিসেবে ইয়াযীদের পক্ষে বাই'আত গ্রহণ করেন।কিন্তু কেউ খিলাতের এই পদ্ধতি মন থেকে মেনে নিতে পারেনি।তাই তারা ৬০ হিজরীতে ইয়াযীদের পক্ষে বাই'আত গ্রহণের শুরু হলে মদীনার গভর্নর ওলীদ ইবনে উতবার

কাছে ফরমান জারী করে। অন্যদিকে কুফা বাসীরা হুসাইন (রা.) কে গোপনভাবে চিঠি প্রদান করে আমন্ত্রণ করে।তাদের প্রতি সুধারণা রেখেই তিনি কুফায় চলে আসেন এবং কারবালার প্রান্তরে নির্মমভাবে পুরো পরিবারসহ শহীদ হন।

## ■ ১৪) হামযাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.):

- হামযার হত্যাকারী ওয়াহশী (রা.) মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম কবুল করে নবী করীম (সা.)_ এর খিদমতে হাজির হলেন। নবী করীম (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ওয়াহশী? জবাব দিলেন,হ্যা। তুমিইকি হামযাহকে হত্যা করেছো? জবাব দিলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) যা শুনেছেন, তা সত্যি। নবী করীম (সা.) বল্লেন, তুমি কি তোমার মুখমন্ডল আমার কাছে একটু গোপন করতে পারো? তক্ষুনি তিনি বাইরে বেরিয়ে যান এবং জীবনে আর কখনো নবী করীম (সা.)_ এর মুখোমুখি হন নি।”

**আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিতঃ**

তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, গত রাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম যে, জাফর ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর হামযা খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে।”

**নাম ও পরিচিতিঃ**

তাঁর নাম হামযাহ, আবু ইয়ালা ও উপনাম আবু আম্মারা এবং আসাদুল্লাহ হলো উপাধি। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)_ এর আপনা চাচা। হামযার মাতার নাম হালা বিনতু উহাইব নবী করীম (সা.)_ এর মা আমিনার চাচাতো বোন। এছাড়া হামযাহ ছিলেন নবী করীম (সা.)_ এর দুধ ভাই। আবু লাহাবের দাসী “সুওয়াইবা” তাঁদের দুজনকেই দুধ পান করিয়েছিলেন। বয়সে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চেয়ে দু বছর মতান্তরে চার বছরের বড়।

**ইসলাম গ্রহণঃ**

এটা মুসলমানের সেই দুঃসময়ের কথা যখন মাত্র হাতে-গোনা কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং আবুল আরকামের ঘরে আশ্রয় নিয়ে ইসলামের প্রচার করতেন। হামযাহ (রা.)_ এর ইসলাম গ্রহণ একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করে। হামযাহ (রা.)_ এর ইসলাম গ্রহণের পরপরই উমার (রা.) ও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন।

**উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরনঃ**

যেহেতু হামযাহ (রা.) বদর যুদ্ধে কুরাইশদের অনেক বীর পুরুষদের হত্যা করেছিলেন,এ কারনে কুরাইশদের সকলেই তাঁরই খুনের তৃষ্ণা ছিলো সবচেয়ে বেশি। ওয়াহশী উহুদ ময়দানে হামযাহ (রা.) কে হত্যা করে,পরে তিনি বলেন, আমি ছিলাম যুবাইর ইবনে মুত'য়িমের এক হাবশী ক্রীতদাস।বদর যুদ্ধে যুবাইরের চাচা তুয়াইম ইবনে আদী হামযাহর হাতে নিহত হয়।সেই জন্য তিনি ওয়াহশিকে বিশেষভাবে ট্রেনিং করে যাতে উহুদের দিন হামযাহ (রা.) কে শহীদ করতে পারে। হামযার শাহাদাত লাভের পর কুরাইশ মহিলারা আনন্দ করপ,বিশেষ করে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা হামযাহ (রা.) এর নাক-কেটে নিয়ে যায় এবং কলিজা চর্বণ করে।

**সাইয়্যেদুশ শুহাদা উপাধিঃ**

যুদ্ধ শেষে শহীদের দাফন-কাফনের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্মানিত চাচার মর্মান্তিক দৃশ্য অবলোকন করে কেঁদে ফেলেন এবং তিনি বল্লেন, “কিয়ামতের দিন হামযাহ হবে “**সাইয়্যেদুশ শুহাদা”** তথা “**সকল শহীদের সর্দার”।**

**কাফনঃ**

সাফিয়া ছিলেন হামযাহ (রা.)_এর বোন, ভাইয়ের শাহাদাতের খবর শুনে তাঁকে একদৃষ্টি দেখার জন্য দৌড়ে আসেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে দেখতে না দিয়ে কিছু সান্ত্বনা দিয়ে ফিরিয়ে দেন।ভাইয়ের কাফনের জন্য দুখানা চাঁদর নিয়ে আসেন।কিন্তু হামযাহর পাশে আরেকটি লাশও কাফনহীন অবস্থায় পরে ছিলো। তাই চাদর দুখানি দুজনের মনে বন্টন করে দেওয়া হয়। পা আবৃত করলে মাথা দেখা যেত,আবার মাথা আবৃত করলে পা দেখা যেত। তাি চাঁদর দিয়ে মাথা এবং ইজখির ঘাস দিয়ে পা আবৃত করে দাফন সম্পন্ন করলাম। উহুদের ময়দানেই সমাহিত করা হয়।

## ■ অধ্যায়-০৭ঃ সাহাবীদের অবদান( ইসলাম প্রচার, যুদ্ধ, শিক্ষা ও কুরআন সংরক্ষণ):

ইসলামের প্রচার ও সংরক্ষণে সাহাবীদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)_ এর সহচর; সহযোদ্ধা ; শিক্ষার্থী ও উত্তরসূরী। ইসলামের দাওয়াত প্রচার; কুরআন সংরক্ষণ ; হাদীসের রেকর্ড রাখা; শরীয়তের বিধান প্রতিষ্ঠা সবকিছুতেই সাহাবীদের ভূমিকা ছিলো কেন্দ্রীয়। ইসলামের ভিত্তি স্থাপন থেকে শুরু করে বিশ্বময় প্রসার পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে সাহাবীরা নিজেদের জীবন; সম্পদ ও সময় উৎসর্গ করেছেন।

ইসলামের সূচনালগ্নে যখন মক্কার মুশরিকরা নবীজীর দাওয়াতকে অস্বীকার করছিলো, তখন কিছু সাহাবী গোপনে ইসলামের বার্তা প্রচার শুরু করেন।

- হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন প্রথম দিকের দাঈ (দাওয়াতদাতা)। তাঁর প্রচেষ্টায় উসমান (রা.); আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.); তালহা (রা.) প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করেন।

**হিজরতের মাধ্যমে ইসলাম প্রসারঃ**

মক্কায় নির্যাতনের কারনে নবীজীর নির্দেশে সাহাবীদের দল প্রথম ও দ্বিতীয়বার **হাবশায়** হিজরত করেন। এরা ইসলামের প্রথম বিদেশি দূত হিসেবে কাজ করেন যার প্রভাবে হাবশার রাজা নাজ্জাশিও ইসলাম গ্রহণ করেন। এটি ইসলামি দাওয়াতের প্রথম সাফল্য।
পরবর্তীতে মদীনায় হিজরতের মাধ্যমে ইসলাম একটি রাষ্ট্রীয় ভিত্তি পায়। আনসার সাহাবীরা নবীজীকে আশ্রয় দিয়ে দাওয়াতের নতুন পথ খুলে দেয়। যা রাসূলের মৃত্যুর পর সাহাবীরা দাওয়াতি কার্যক্রম ধরে রাখে।

**যুদ্ধসমূহে সাহাবীদের ত্যাগঃ**

বদর যুদ্ধ ; উহুদ যুদ্ধ ; খন্দক যুদ্ধসহ হুনাইন,তাবুক ও অন্যান্য সব যুদ্ধে সাহাবীরা রাসূলকে আগলে রাখেন। এসব যুদ্ধেও সাহাবীদের দাওয়াত ; সাহস ও ধৈর্য্যের মাধ্যমে ইসলামকে বিজয় দান করেন।

**কুরআন সংরক্ষণে সাহাবীদের ভূমিকাঃ**

কুরআন নাজিলের সাথে সাথে নবীজীর নির্দেশে সাহাবীরা তা মুখস্থ করতেন এবং লিখে রাখতেন।

■ যুবাইর ইবনে সা'দ ; উবাই ইবনে কা'ব; যায়েদ ইবনে সাবিত ; আলী (রা.) প্রমুখ ছিলেন প্রধান কাতিবে ওহী (ওহী লেখক)

■ নবীজীর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালে কুরআনের আয়াতগুলো একত্র করে সংরক্ষণ করা হয়।

■ পরবর্তীতে হযরত উসমান (রা.) কুরআনের একটি মূল কপি তৈরি করে ইসলামি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পাঠান– এটি **"মুসহাফে উসমানি"** নামে পরিচিত।

এই প্রচেষ্টায় সাহাবীরা কুরআনকে বিকৃত ও ভুল ব্যাখ্যা থেকে রক্ষা করেন।

**মুখস্থকারীদের(হাফেজদের) অবদানঃ**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ; সালিম মাওলা আবু হুযাইফা (রা.); আবু দারদা (রা.) ; উবাই ইবনে কা'ব (রা.)_ এরা ছিলেন কুরআনের প্রধান হাফেজ। তাঁদের তিলাওয়াতের ধরন পরবর্তীতে জিরআতের বিভিন্ন ধারা (কিরআত সাবা'আ) হিসেবে সংরক্ষিত হয়।

**হাদীস সংরক্ষণে সাহাবীদের ভূমিকাঃ**

নবীজীর প্রতিটি কথা,কাজ, অনুমোদন সাহাবীরা মনোযোগ সহকারে শুনতেন।

■ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) একাই ৫০০০+ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

■ আয়েশা (রা.) হাদীসের অন্যতম বিশিষ্ট আলিমা,যিনি নারী ও গৃহস্থালির বিষয়ে হাদীস সংরক্ষণ করেন।

■ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ; ইবনে আব্বাস ; আনাস ইবনে মালিক (রা.) প্রমুখ সাাহবীরা শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে হাদীস প্রচার করেন।

**লিখিত সংরক্ষণঃ**

যদিও নবীজীর জীবদ্দশায় আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীস ও কুরআন সংরক্ষণ করা হতো না। কারন মিশে যাওয়ার আশঙ্কা ছিলো। তবুও কিছু সাহাবী তা ব্যক্তিগতভাবে লিখতেন।

■ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) ; নবীজীর অনুমতিতে **“আস-সহিফাতুস-সাদিকাহ”** নামে একটি হাদীস সংকলন করেছিলেন।

■ পরবর্তীতে তাবেঈরা তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে সহীহ হাদীস সংকলনের সূচনা করেন।

**ইসলামি ফিকহে সাহাবীদের চিন্তাধারাঃ**

নবীজীর মৃত্যুর পর বিভিন্ন স্থানে সাহবীরা ইসলামি শিক্ষা প্রচার করেন।

■ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ( রা.)-- **কুফায়**
■ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-- **মক্কায়**
■ জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-- **মদীনায়**
■ আবু মুসা আশ-আরি (রা.)-- **বসরায়**
■ মুয়া'য ইবনে জাবাল (রা.)-- ইয়েমেনে দাওয়াত শিক্ষা প্রচার করেন।

**এই অঞ্চলগুলো পরবর্তীতে ইসলামি ফিক্বহের চারটি প্রধান মাযহাবের ভিত্তি স্থাপন করেন।**

■ **ইসলামী আদালত ও প্রশাসনে সাহাবীদের ভূমিকাঃ**

খিলাফতে রাশেদীনের যুগে সাহাবীরাই ছিলেন প্রশাসক ;বিচারক ও সেনাপতি।

■ হযরত উমার (রা.) ইসলামী প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে সংগঠিত করেন
■ আলী (রা.) ছিলেন বিশিষ্ট বিচারক ও ফিকহবিদ।

তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতেন, যা আজও ইসলামি শরীয়তের মৌলিক রূপ হিসেবে বিদ্যমান।

**ইসলামের আন্তর্জাতিক প্রচারে সাহাবীদের ভূমিকাঃ**

সাহাবীরা শুধু আরবে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তাঁরা ইসলাম বিশ্বে ছড়িয়ে দেন।

■ খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) সিরিয়া ও ইরাকে ইসলাম প্রচার করেন।

■ আমর ইবনে আস (রা.) মিশর জয় করেন।

■ সা'দ  ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) পারস্যে ইসলাম পৌঁছে দেন।

■ মুয়া'য ইবনে জাবাল (রা.) ইয়েমেনে ইসলাম প্রচার করেন।

**তাদের সাহস; আদর্শ ও ন্যায়পরায়ণতা স্থানীয় জনগণের হৃদয়ে ইসলামকে স্থায়ী করে তোলে।**

## ■ অধ্যায়-০৮ঃ সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা ও অনুসরণের নির্দেশঃ

সাহাবীরা ছিলেন ইসলামি ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, যারা সরাসরি নবী মুহাম্মদ (সা.)_ এর সান্নিধ্যে ছিলেন। তাঁরা কুরআনের আয়াত শুনেছেন, নবীজীর মুখ থেকে হাদীস শিখেছেন, তাঁর নির্দেশে জীবন পরিচালনা করেছেন। তাই তাঁদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রাখা শুধু আবেগ নয় বরং এটি **ঈমানের একটি অংশ।**

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) উভয়েই কুরআন ও হাদীসে সাহাবীদের মর্যাদা ও তাঁদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

■ আল্লাহ তা'য়ালা সূরা তাওবাহ এর ১০০ নং আয়াতে বলেন,
মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং যারা তাঁদের অনুসরণ করেছে সৎকর্মে, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।।

■ সূরা আল-হাশরের ০৮-১০ নং আয়াতেও আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,
"আর যারা তাঁদের পরে এসেছে, তারা বলে হে আমাদরে পালনকর্তা! আমাদের ও আমাদের পূর্বসূরি ঈমানদার ভাইদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের অন্তরে তাঁদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না,যারা ঈমান এনেছে।"

■ এখানে আল্লাহ তায়ালা শিক্ষা দিয়েছেন যে, পরবর্তী মুসলমানরা সাহাবিদের জন্য দোয়া করবে এবং তাঁদের প্রতি কোনো হিংসা বা বিদ্বেষ রাখবে না।
**অতএব, সাহাবীদের ভালোবাসা হলো একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য।**

■ সূরা নিসাতেও **১১৫** নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে, সঠিক পথ প্রকাশ পাওয়ার পর, এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করে আমি তাকে তার পছন্দের পথেই যেতে দেব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।"

**এই আয়াতে "মুমিনদের পথ" বলতে সাহাবীদের পথ বোঝানো হয়েছে, সুতরাং যে সাহাবীদের পথ থেকে বিচ্যুত হবে,সে পথভ্রষ্ট।**

**সহীহ বুখারী ও মুসলিম হাদীসেও রাসূল (সা.) বলেন,**

আমার সাহাবীদের গালি দিও না। আমার শপথ আল্লাহর নামে যদি তোমরা কেউ উহুদের সমপরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করো তবুও আমার সাহাবীদের একজনের একমুঠো দান বা তার অর্ধেকের সমানও হতে পারবে না। **(সহীহ বুখারী ৩৬৭৩,সহীহ মুসলিম ২৫৪১)**

অর্থাৎ সাহাবীদের মর্যাদা এত উচ্চ যে তাঁদের সামান্য কর্মও পরবর্তীদের বিশাল দানের চেয়ে মূল্যবান।

■ **তিরমিজি শরীফে বর্ণিতঃ**

যে ব্যক্তি সাহাবীদেরকে ভালোবাসবে সে আমাকেও ভালোবাসবে, আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে,সে আমাকে ঘৃণা করবে।

■ **সহীহ মুসলিমে রাসূল (সা.)** বলেন,

"আমার সাহাবীদের প্রতি আল্লাহ ভীরু হও।তাঁদের পর কেউ যেন তাঁদেরকে অপমান না করে। যে তাঁদেরকে ভালোবাসে,সে আমার ভালোবাসার কারনে ভালোবাসে। আর যে তাঁদের শত্রুতা করে, সে আমার প্রতি শত্রুতা করার কারনে করে।"

**তাই সাহাবীদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা এবং তাঁদের অনুসরণ করা উচিত।**

## ■ অধ্যায়-০৯ঃ সাহাবীদের সম্পর্কে বিভ্রান্ত মতবাদ ও তার জবাবঃ

সাহাবায়ে কেরাম (رَضِيَ اللهُ عَنْهُم) হলেন সেই মহৎ ব্যক্তিবর্গ যারা রাসূল (সা.)_এর সহচর ছিলেন,ইসলামের জন্য সংগ্রাম করেছেন, কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ঈমানের অংশ, আর তাঁদের প্রতি ঘৃণা বা অপমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)_এর নিদর্শনের বিরোধিতা।

- কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে।
- সাহাবীদের নিন্দা করা বা তাঁদের মধ্যে ফিতনা ছড়ানো মারাত্মক গুনাহ।
- তাদের ত্রুটি খুঁজে বের করা বা অবজ্ঞা করা ঈমানের জন্য বিপদজনক।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, সাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখলে কেবল কাফির ও মুনাফিকদের হৃদয়ে ক্ষোভ জন্মাতে পারে কোনো মুসলমানের অন্তরে নয়।

তাই যে সাহাবীদের অপছন্দ করে বা তাঁদের ঘৃণা করে, সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ তাঁর ঈমানের অবস্থা সন্দেহজনক।।

**রাসূল (সা.) কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন তাঁর সাহাবীদের নিয়ে কোনো অসম্মানজনক কথা বলতে।**

**হাদীস-০১ঃ**

আমার সাহাবীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো। তাঁদের প্রতি কোনো অপমান বা ঘৃণা পোষণ করো না। কারন যেই তাঁদের প্রতি ঘৃণা রাখবে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন। **(তিরমিজি)**

সাহাবীদের প্রতি সামান্য অপমানও আল্লাহর ক্রোধ ডেকে আনে।

**হাদীস-০২ঃ**

আমার সাহাবীদের গাল দিও না। তোমরা কেউ যদি উহুদ পরিমাণ স্বর্ণও দান করো তবুও তাদের একমুঠো দানের সমান হবে না। **(সহীহ বুখারী,সহীহ মুসলিম)**

**সাহাবীদের সমালোচনা ঈমানের জন্য বিপদজনকঃ**

আল্লাহ তা'য়ালা সূরা হুজুরাতের ০২ নং আয়াতে বলেন,

**يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ**

**অর্থঃ** হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না এবং তোমরা নিজেরা পরস্পর যেমন উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরকম উচ্চস্বরে কথা বলো না। এ আশঙ্কায় যে তোমাদের সকল আমল-নিষ্ফল হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না।

এখানে সেই আদব, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মর্যাদা-সম্মানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যা প্রত্যেক মুসলিমকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য নিবেদন করতে হয়।

- প্রথম আদব হল, তাঁর উপস্থিতিতে যখন তোমরা আপোসে কথোপকথন কর, তখন তোমাদের কণ্ঠস্বর যেন তাঁর কণ্ঠস্বরের উপর উঁচু না হয়ে যায়।

দ্বিতীয় আদব হল, যখন নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে কথোপকথন কর, তখন অতি বিনয়, ভদ্রতা ও ধীরতার সাথে কর। ঐভাবে উচ্চৈঃস্বরে তাঁর সাথে কথা বলো না, যেভাবে তোমরা আপোসে নিঃসংকোচে পরস্পরের সাথে বলে থাক।

কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল, 'হে মুহাম্মাদ! হে আহমাদ!' বলে ডেকো না, বরং শ্রদ্ধার সাথে 'হে আল্লাহর রসূল!' বলে সম্বোধন করো। যদি আদব ও শ্রদ্ধা-সম্মানের এই দাবীগুলোর খেয়াল না কর, তবে বেআদবী হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যার ফলে তোমাদের সৎকর্মাদি নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে, অথচ তোমরা তার কোন টেরও পাবে না। এই আয়াতের 'শানে নুযূল' (অবতরণের পটভূমিকা) জানার জন্য দেখুনঃ বুখারী, তাফসীর সূরা হুজুরাত। তবে নির্দেশের দিক দিয়ে আয়াতটি ব্যাপক।

**যদি সাহাবীদের নবীর সামনে কণ্ঠ উঁচু করা নিষিদ্ধ হয়, তবে আজ তাঁদের সম্মানহানি করা কত বড় অপরাধ তা সহজেই অনুমান করা যায়।**

**আল্লাহ তা'য়ালা সূরা হাশরের ১০ নং আয়াতে বলেন,**

**وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ**

**অর্থঃ** যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।

এরা হল 'মালে ফাই' পাওয়ার তৃতীয় অধিকারী দল।
অর্থাৎ, সাহাবীদের পর আগত এবং তাঁদের অনুসরণকারী। এতে তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল ঈমানদার ও আল্লাহভীরু শামিল।

তবে শর্ত হল, তাদেরকে আনসার ও মুহাজিরদেরকে মু'মিন জেনে তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাকারী হতে হবে। তাঁদের ঈমানে সন্দেহ পোষণকারী, তাঁদেরকে গালি-মন্দকারী এবং তাঁদের বিরুদ্ধে নিজেদের অন্তরে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণকারী হলে হবে না।

ইমাম মালেক (রঃ) এই আয়াত থেকেই তথ্য সংগ্রহ করে বলেছেন যে, 'রাফেযী (শিয়া), যে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-দেরকে গাল-মন্দ করে, সে 'মালে ফাই' থেকে কোন অংশ পাবে না।

কেননা, মহান আল্লাহ সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু রাফেযী তাঁদের নিন্দা গেয়ে বেড়ায়। **(ইবনে কাসীর)**

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তোমাদেরকে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সাহাবীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তোমরা তাঁদেরকে গালি দিলে! আমি তোমাদের নবীকে বলতে শুনেছি যে, "এই জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ না তাদের পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকেদেরকে অভিসম্পাত করবে।" (বাগবী)

আল্লাহ তায়ালা নিজেই নির্দেশ দিয়েছেন, সাহাবীদের জন্য দোয়া করতে হবে, তাঁদের সমালোচনা নয় বরং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

- তাঁদের সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক কথা বলা থেকে বিরত থাকা।
- তাঁদের পারস্পরিক মতভেদ নিয়ে বিতর্ক না করা।
- তাদের জীবনী থেকে শিক্ষা নেওয়া।
- তাদের জন্য নিয়মিত দোয়া করা।

**اللَّهُمَّ ارض عَنْ الصحابة اجمَعِينُ**

**অর্থঃ হে আল্লাহ! সমস্ত সাহাবীদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট হও।**

সাহাবায়ে কিরাম (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم) ইসলামের ভিত্তি। তাঁদের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ, আর তাঁদের অপমান ঈমান নষ্ট করে দেয়।

**اللَّهُمَّ احْشرنَا فِيْ زمرتهم، و لَا تَجْعَل فِيْ قُلُوْبُنَا غلَا للذِيْنَ اَمَنُوْ**

**অর্থঃ** হে আল্লাহ! আমাদেরকে সাহাবীদের দলের সঙ্গে পুনরুত্থিত করো এবং আমাদের হৃদয়ে ঈমানদারদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ রেখো না।

## ■ অধ্যায়-১০ঃ সাহাবীদের জীবনি থেকে শিক্ষাঃ

সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন শুধু রাসূলের সঙ্গী নন বরং তারা ছিলেন– নৈতিকতা ; চরিত্র ; সততা ও মানবতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

■ তাদের জীবনে কুরআনের শিক্ষা এমনভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল যে, তাঁরা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বোত্তম প্রজন্ম হিসেবে স্বীকৃত হন।

■ কুরআন তাঁদের সেই আদর্শিক জীবনকে তুলে ধরে আমাদের জন্য শিক্ষা রেখেছেন,যেন আমরাও তাঁদের অনুসরণ করতে পারি।

**সত্যবাদীতাঃ**

সূরা তাওবার ১১৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

**يَا أَيُّهَا اللَّذِيْنَ اٰمَنُوْ اتَّقُوْ اللَّهَ وَ كُوْنُوْ مَعَ الصَّادِقِيْنَ**

**অর্থঃ** "হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।"

- ■ সাহাবারা ছিলেন সত্যবাদীতার প্রতীক।
- ■ হযরত আবু বকর (রা.) "আস-সিদ্দীক" উপাধি পেয়েছিলেন তাঁর নিখুঁত সততার কারনে।
- ■ তাঁরা কখনো মিথ্যা বলেন নি– এমনকি বিপদের সময়েও সত্য বলতেন।

**ধৈর্য্য ও সহনশীলতাঃ**

আল্লাহ তা'য়ালা সূরা বাক্বারাহ ১৫৫ নং আয়াতে বলেন,

**وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ**

**অর্থঃ** আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।

- ■ সাহাবীদের জীবনে ধৈর্য্য ছিলো ঈমানের অলংকার।
- ■ মক্কায় তাঁরা নির্যাতন সহ্য করেছেন,সম্পদ হারিয়েছেন তবুও ঈমান ছাড়েন নি।
- ■ যেমন বিলাল (রা.) বারবার কষ্টের মধ্যেও বলতেন আহাদ; আহাদ (এক আল্লাহ,এক আল্লাহ)

**ত্যাগ ও নিঃস্বার্থতাঃ**

আল্লাহ তায়ালা সূরা হাশরের ০৯ নং আয়াতে বলেন,

**وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ**

**অর্থঃ** তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্বেও অন্যদেরকে নিজেদের উপরে অগ্রাধিকার দেয়।

- এটি আনসার সাহাবীরদের বৈশিষ্ট্য ছিলো– তাঁরা মুহাজিরদের সঙ্গে তাঁদের ঘর,খাবার, সম্পদ ভাগ করে নিতেন।
- নিঃস্বার্থ দান তাঁদের চরিত্রের একটি অপরিহার্য অংশ ছিলো।

**ন্যায়বিচারঃ**

সূরা নাহলের ৯০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

**إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ**

**অর্থঃ** "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচরণের নির্দেশ দেন"

- সাহাবারা এই আয়াতকে জীবনে প্রয়োগ করেছেন।
- খলিফা উমার (রা.) তাঁর বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য বিশ্বব্যাপী উদাহরণ।
- তিনি বলেছেন: "যদি ইউফ্রাত নদীর পাশে একটি গাধা ক্ষুধায় মারা যায়, আমি ভয় করি আল্লাহ তায়ালা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন।"

**বিনয় ও নম্রতাঃ**

সূরা ফুরকনের ৬৩ নং আয়াতে বলেন,

**وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلٰى الْأَرْضِ هَوْنًا**

**অর্থঃ** "রহমানের বান্দারা তারা,যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে।"

- সাহাবাদের চরিত্রে বিনয় ছিলো প্রবল।
- তারা ক্ষমতা ও সম্পদের মালিক হয়েও কখনো অহংকার করতেন না।
- হযরত উমার (রা.) খলিফা হয়েও সাধারণ বস্ত্র পড়তেন এবং নিজ হাতে খাবার বিতরণ করতেন।

**ক্ষমাশীলতাঃ**

সূরা নূরের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

**وَ لْيَعْفُوْ وَ لْيَصْفَحُوْ ،أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ**

**অর্থঃ** " তাঁরা যেন ক্ষমা করে ও উপেক্ষা করে; তোমরা কি চাও না,যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন?"

- সাহাবারা ছিলেন ক্ষমাশীল ও সহানুভূতিশীল।
- হযরত আবু বকর (রা.) সেই আত্মীয়কেও ক্ষমা করেছিলেন, যে তাঁর কন্যা আয়েশা (রা.)_এর বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করেছিলো।

**আল্লাহর উপর ভরসাঃ**

সূরা মায়িদার ২৩ নং আয়াতে বলেন,

**وَ عَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنُوْنَ**

**অর্থঃ** "যদি তোমরা মুমিন হও, তবে আল্লাহর উপরই ভরসা কর।"

- সাহাবারা যুদ্ধে ;দাওয়াতে; বিপদে সর্বদা আল্লাহর উপর নির্ভর করতেন।
- বদরের যুদ্ধে তাঁরা সংখ্যায় কম হলেও দৃঢ় ঈমানের জোরে জয়লাভ করেছিলেন।

**দানশীলতাঃ**

সূরা আলে-ইমরানের ৯২ নং আয়াতে বলেন,

**لَنْ تَنَالُوْ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْ مِمَّا تُحِبُّوْنَ**

**অর্থঃ** "তোমরা কখনো কল্যাণে পৌঁছাবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান কর।"

- সাহাবীরা সবচেয়ে প্রিয় সম্পদও দান করেছেন আল্লাহর পথে।
- হযরত উসমান (রা.) পুরো কূপ ক্রয় করে মদীনার মানুষের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।

## ■অধ্যায়-১১ঃ উপসংহার

সাহাবীদের জীবন শুধু ইতিহাস নয়– এটি এক জীবন্ত ইসলামি পাঠশালা।
তাঁদের অনুসরণ করলে ব্যক্তিজীবন; সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়; দয়া ও ঈমান প্রতিষ্ঠিত হবে।

সাহাবীদের নবী প্রেম ছিলো ঈমানের প্রাণশক্তি।
তাঁদের ভালোবাসায় ছিলো নিষ্ঠা; আনুগত্য ও আত্মত্যাগের প্রতীক।
আজকের মুসলমানদের উচিত সেই ভালোবাসার পুনর্জাগরণ করা– কারন নবীর ভালোবাসা আর সাহাবীদের প্রতি শ্রদ্ধা ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না।

**"সাহাবীদের জীবন হলো আলোকবর্তিকা ; যারা তা অনুসরণ করে তারা কখনও অন্ধকারে হারিয়ে যেতে পারে না।"**

**رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ رَضُوْا عَنْهُ**

**অর্থঃ আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।**

■ তথ্যউপাত্ত সংগ্রহঃ

০১) মাসিক আল-কাউসার পত্রিকা
০২) উইকিপিডিয়া

বইসমূহঃ
সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবনি
সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা
কুরআনের আয়াত ও তাফসীর (গ্রীনটেক ওয়ার্ড বাই তাফসীর)
হাদীসের আয়াতঃ আল-হাদীস এপস